# শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

সম্পাদক : ড. বিশ্বনাথ সরকার

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

# শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

সম্পাদক : ড. বিশ্বনাথ সরকার

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ ❑ জুন ২০০৬

উপদেষ্টা : মাহমুদ শফিক

সম্পাদক : ড. বিশ্বনাথ সরকার, গবেষণা কর্মকর্তা

নির্বাহী সম্পাদক : মোঃ রবিউল ইসলাম, সংরক্ষণ কর্মকর্তা
এ. কে. এম আজাদ সরকার, প্রদর্শন কর্মকর্তা

সহযোগিতা : এ কে এম মুজ্জামিল হক, গাইড লেকচারার

প্রকাশক ❑ পরিচালক
মোঃ শফিক-উল-ইসলাম
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

প্রচ্ছদ ❑ মোঃ মোখলেছুর রহমান

মুদ্রণ ❑ ইয়ানা এন্টারপ্রাইজ
২০৭/১ ফকিরেরপুল ১ম গলি
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

**ISBN : 984-32-3367-0**

মূল্য : টাকা ৭৫/- (টাকা : পঁচাত্তর মাত্র)

উৎসর্গ

লোকশিল্প গবেষকবৃন্দ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন | ৯ |
| শিল্পাচার্য ও লোক কারুশিল্প | ২৮ |
| জয়নুল আবেদিন ঃ কর্ম ও ব্যক্তিত্ব | ৩৪ |
| জয়নুলের শিল্প আঙ্গিক | ৩৯ |
| শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন | ৪৪ |
| প্লেট | ৫২ |

# শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

মাহমুদ শফিক

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-৭৬) ছিলেন বাংলাদেশের মহৎ শিল্পীদের মধ্যে একজন, যার চিন্তা ও দর্শনে ছিল মানব কল্যাণবোধ। তিনি চিত্রকলা ও মানব কল্যাণকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। তার আগে বাংলার চিত্রকলাকে নতুন মাত্রা দান করেন গগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬), ক্ষিতিশচন্দ্র মজুমদার (১৮৯১-১৯৭৫), হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯৪-১৯৪৮), অতুলচন্দ্র বসু (১৮৯৮-১৯৭৭)। এ সময় ভারতীয় চিত্রকলার পৌরাণিক ও লোকজ রীতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে ইউরোপীয় রীতি। আঙ্গিক ও রঙের ব্যবহারে এসেছে পরিবর্তন। চিত্রকলার সহজ-সরল প্রকৃতির সঙ্গে বিমূর্ত রীতির প্রচলন হয়েছে। বিক্ষুব্ধ সময়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চিত্রকলায়। ১৯৩৩ সালে যখন জয়নুল আবেদিন কলকাতায় যান, তখন কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের বয়স ৬৭ বছর পার হয়ে গিয়েছে। স্কুলের পাঠদানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রীতির প্রচলনের ফলে বাঙালি শিল্পীদের মনে আধুনিক রীতির প্রভাব পড়েছে। ১৮৯৬-১৯০৫ কাল পর্বে অধ্যক্ষ ই,বি, হ্যাভেলের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। কলকাতা আর্ট স্কুলে জয়নুল আবেদিনের অধ্যায়নকালে (১৯৩৩-৩৮) অধ্যক্ষ ছিলেন মুকুল দে (১৮৯৫-১৯৯১)। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলের অঙ্কন রীতিতে পরিবর্তন আনেন। পাশ্চত্য রীতির সঙ্গে প্রাচ্যশিল্প রীতির সংমিশ্রন ঘটান। রেনেসাঁসের পর থেকে ইউরোপীয় শিল্পরীতিতে প্রবল প্রভাব ফেলে ন্যাচারালিজম বা অনুকরণবাদ। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়র্ধে ইমপ্রেশনিজম সৃষ্টি করে নতুন অভিঘাত। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন একই সঙ্গে ছিলেন ন্যাচারালিস্ট এবং ইমপ্রেশনিস্ট।

ইমপ্রেশনিস্ট রীতির ছবিগুলো অনেকটা বাস্তবধর্মী। শিল্পী প্রথমে দৃশ্যগুলো দ্রুত দেখে নেন। এরপর দেন রঙের পোচ। অভিজ্ঞতালব্ধ দৃশ্যগুলোতে থাকে বাস্তবতার আলো-ছায়ার খেলা। সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে ছবি আঁকতে হয়। তাই ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি কাছ থেকে বোঝা যায় না। দূরে গিয়ে

দেখতে হয়। ইমপ্রেশনিস্টদের চিত্রকলার উপাদান হচ্ছে খোলা আকাশ, অবারিত মাঠ, সমুদ্র ও নদী।

প্রতি মুহূর্তে বদলে যায় প্রকৃতির রূপ। প্রকৃতির রং ভোরবেলায় এক রকম থাকে। দুপুরে তা বদলে যায়। এরপর রং বদলাতে বদলাতে ধূসর গোধূলির পর নেমে আসে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর রাতের গভীর অন্ধকার। প্রকৃতির রূপ বদলানোর চিত্র ফুটে উঠেছে জয়নুলের চিত্রে। তার সহজ সরল অভিব্যক্তির মধ্যে রয়েছে গুরু-গম্ভীরতা, যাকে শিল্পের ভাষায় বলা হয় সাবলাইম। সাবলাইমের মধ্যে থাকে বিস্ময়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভয়। এ থেকেই মানুষ মহৎ হবার উপলব্ধি খুঁজে পায়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা, হোমারের ওডেসি কিংবা রবীন্দ্রনাথের পূজার গানেও অনুরূপ উপাদান রয়েছে। একটি ভিন্ন আঙ্গিকে আঁকা জয়নুলের 'যুগল রমণীর' মধ্যেও রয়েছে বিস্ময়ের অনুভূতি। অথচ ছবিটি কালো কালিতে আঁকা।

মহৎ শিল্পীদের মধ্যে রয়েছে একই সঙ্গে সৌন্দর্য, বিস্ময় ও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা। যেমন, সেক্সপীয়রের হ্যামলেট কিংবা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দি সি। ইমপ্রেশনিস্ট বিরোধী ফবিস্ট শিল্পীদের মধ্যেও সাবলাইম উপাদান রয়েছে। ফরিস্টরা চেয়েছেন পাশবিক রঙের সঙ্গে ভয়ঙ্কর অনুভূতির সংমিশ্রন ঘটাতে। তারা মনে করতেন, ইমপ্রেশনিস্টদের ফুরফরে রং হচ্ছে জলো। তাই চিত্রে প্রয়োজন বলিষ্ঠ আবেগ এবং কর্কশ রূপ। জয়নুলের 'মুক্তিযোদ্ধা' চিত্রে অনুরূপ অনুভাবনা রয়েছে। তার ছবিতে প্রধান হয়ে উঠেছে লোকসমাজ। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ধারার অনুসারী। এই ধারার প্রধান শিল্পীও হচ্ছেন তিনি। আবহমান বাংলার নিসর্গ ও মানুষের চিত্র কালজয়ী হয়ে আছে তার শিল্পকর্মে। এ ধারার শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে নৌকার সারি, নদীর ধার, মৎস্য শিকার, কুটির, দুই ব্যক্তির মাছ ধরা, নিসর্গ, গ্রামীণ দৃশ্য, মই চাষ, বংশীবাদক, বৃক্ষসারি, বাজারের পথে, বেদে নৌকা, গাছ, গুনটানা, সেতার বাদক, শস্যবহনকারী, হুকা টানা, নৌকা বাইচ ইত্যাদি। এসব চিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের কর্মময় মানুষের জীবনের ছবি। মুসলমান পরিবার থেকে উঠে আসা জয়নুল ভারতীয় পুরাণে আশ্রয় নেননি। এটা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কারণ, তিনি জন্ম লাভ করেছেন একটি ছোট শহরে। তখনো সেখানে নাগরিক পরিবেশ গড়ে উঠেনি। তিনি শহর ও গ্রামের অনুরণন উপলব্ধি করেছেন নিজের ভেতরে। তাই তার মানস গঠনে প্রভাব ফেলেছে অপরূপ নিসর্গ। ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে কেটেছে তার ছেলেবেলা। তাই তার চিত্রে ঘুরে ফিরে এসেছে নৌকা ও পল্লী রমণী। একই সঙ্গে তিনি দেখেছেন আদিবাসী জীবন এবং গারো পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করে নেমে থাকা আকাশ। আদিবাসীদের জীবন তার মনে

প্রভাব ফেলেছে। এসব চিত্রের মধ্যে রয়েছে উপজাতীয় রমণী, দুই উপজাতীয় মেয়ে, মহিলা ও হরিণ, দুমকা, একজন উপজাতি, সাঁওতাল ইত্যাদি।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন উপজাতি পুরুষ ও মহিলার ছবি অঙ্কন করার সময় তাদের উৎসের কথা মনে রেখেছেন। গারোরা মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ। গারোদের ভুরু ভারি ও গায়ের রঙ ফর্সা। তাদের চেহারার মধ্যে রয়েছে একটি সরল ভঙ্গি। ক্রেয়ন প্যাস্টেলে আঁকা উপজাতীয় রমণী চিত্রে সেই ভঙ্গিটি রয়েছে। তিনি বেদেদের জীবন তুলে এনেছেন বস্তুনিষ্ঠভাবে। এসব ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন সাধারণ রং। কিন্তু রেখার টান অসাধারণ। তার কালো রঙের 'বেদেনি' চিত্রে রয়েছে সাপের ঝুড়ি মাথায় চারজন বেদেনি। কিন্তু তাদের আকার চার রকম। এর মাধ্যমে তিনি দূরত্ব জ্ঞাপক একটি প্রতীককে তুলে ধরেছেন। অথচ প্রত্যেক বেদেনি পাশাপাশি দাঁড়ানো। তাদের মধ্যে তিন জনের মাথায় এবং একজনের কাঁধে সাপের ঝুড়ি। তাদের মধ্যে দুজনের হাত স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আরেক জনের হাত দেখা যায় একটি। অন্য জনের হাত দেখা যায় না। কিন্তু চিত্রটি একসঙ্গে দেখলে তা বোঝা চায় না। তাদের হাতের ভঙ্গিও বিভিন্ন। এখানেই জয়নুল আবেদিন একই সঙ্গে ইমপ্রেশনিস্ট এবং ন্যাচারালিস্ট। সত্যিকার অর্থে তিনি ছবি আঁকার সময় বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিতেন সবার আগে। অনেকে মনে করেন, জয়নুল একজন প্রতিবাদী শিল্পী। বাস্তবেও তাই। কিন্তু তিনি কখনো উগ্রভাবে রঙ ব্যবহার করেননি। উগ্র ভাব প্রকাশ করেননি। চিত্রকর্মের মাধ্যমে তিনি জীবনের মার্জিত রূপকে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির মধ্যে যে একটি শান্ত রূপ রয়েছে, তা তিনি একজন প্রকৃতিবাদী শিল্পী হিসাবে তুলে ধরেছেন। তার দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার মধ্যেও একই রূপ রয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে সাবলাইম।

শিল্পীরা ধ্বংসের তাণ্ডব, আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত এবং ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যেও সৃষ্টির উন্মাদনা দেখতে পান। সাবলাইমের মানেই হচ্ছে স্বার্থপরতা পরিহার করে মহৎ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তাই জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার মধ্যেও রয়েছে জীবনের দুইপিঠ। এর একদিকে রয়েছে স্বার্থপরতার সংহার রূপ, অন্যদিকে রয়েছে মানবতাবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা। এই পৃথিবী নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নয়। সকল মানুষের। সকল প্রাণীর। এখানে একটি ফুলের ফুটে ওঠার সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত মানুষের। মাঠে-ঘাটে না খেয়ে মানুষ মরেছে। এর দায়ভাগ সভ্য মানুষকেই নিতে হবে। এ থেকে রেহাই পাবার কোনো সুযোগ নেই। শিল্পী জয়নুল এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি এদেশের মানুষকে শেকড়ের সন্ধান দিয়েছেন। সেই অর্থে তাকে পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম বলা যায়। ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের সঙ্গে

জয়নুলের পার্থক্য হচ্ছে ইমপ্রেশনিস্টদের ছবিতে রঙের প্রাধান্য। ড্রয়িং তাদের কাছে গুরুত্বহীন। জয়নুলের চিত্রে ড্রয়িং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন পল সেজানের ভক্ত। সেজানের ছবি মাটি ও পাথরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই তার ছবির অস্থিমজ্জায় রয়েছে চিন্তনের গভীরতা। তেমনি জয়নুলের চিত্রে ফুটে উঠেছে আদিবাসী সমাজ ও লোক সমাজের গভীরতম উপলব্ধি। রোমান্টিক শিল্পীদের মোহাবেশ ও উচ্ছ্বাস রয়েছে তার চিত্রে। তিনি 'বাঙালি কুমারী' ছবিতে ব্যবহার করেছেন লাল ও নীল রঙ। এর সঙ্গে আছে হলুদ রঙের ধূসর আভা। জ্যামিতিক কাঠামোর মধ্যে অব্যক্ত ভাবনার একটি রূপরেখা ফুটে উঠেছে চিত্রে। ইন্দ্রিয় ঘনত্বের জন্য ছবিটির মূল্য অপরিসীম। ইমপ্রেশনিস্টরা প্রাধান্য দেন চলন্ত ভাবকে। আর ফবিস্টরা প্রাধান্য দেন গতিকে। ফিউচারিস্টদের দার্শনিক হচ্ছেন বের্গসঁ। এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরও পড়েছে। তার 'বলাকা' ও 'চঞ্চলা' কবিতা দুটি এর-জ্বলন্ত উদাহরণ। গতির তাড়না থেকে জয়নুল মুক্ত হতে পারেননি। যেমন তার 'মাঝির গুনটানা' ছবি। এটা একান্তভাবেই লোকজ জীবনের ছবি। তবে এতে যে গতির আভাস রয়েছে, তা একান্তভাবেই আধুনিক। এ ধারায়ই আরেকটি চিত্র 'মই চাষ'। স্থিতি জড়তার প্রতিও জয়নুলের আকর্ষণ ছিল। এ কারণে তার মধ্যে কাজ করেছে এক ধরনের দৃঢ় নিবদ্ধ অনুভূতি। এ ধরনের রঙিন ছবির মধ্যে রয়েছে 'বৃক্ষসারি', 'জড় জীবন' কিংবা 'নিসর্গ'।

আধুনিক শিল্পীদের জীবনের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা রয়েছে। এ কারণে তাদের মনে জন্ম নিয়েছে পলায়নপর মনোবৃত্তি। তারা চাইতেন অন্ধকার ও মৃত্যুর কাছে আশ্রয়। যন্ত্রযুগের অসংগতি ও নিষ্পেষণই হচ্ছে এর কারণ। কিন্তু শিল্পাচার্য জয়নুলকে যান্ত্রিক যুগযন্ত্রণা স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ, তিনি আশ্রয় নিয়েছেন লোকসমাজের কাছে। এ কারণেই তার ছবির বিষয়বস্তু হয়েছে 'বংশীবাদক', 'কলসিসহ রমণী', 'পরিবার' কিংবা 'কনে'। এসব চিত্রের মধ্যে রয়েছে লোকসংস্কৃতির উপাদান। 'নবান্ন' নামে একটি স্ক্রল পেইন্টিং-এর মাধ্যমেও তার এই অনুভাবনাকে তিনি বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

জয়নুল আবেদিনের শিল্পচেতনার বিকাশকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। *এর প্রথম স্তরে* পরে ছাত্রজীবন এবং তারপরবর্তী কয়েক বছর। প্রথম স্তরে জয়নুল ছিলেন সহজাত ভাবেই শিল্পী। মানুষ ও নিসর্গের প্রতি তার ছিল প্রবল অনুরাগ। কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার পর তার উন্মেষ পর্ব শুরু হয়। তিনি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা অবস্থায় আর্ট স্কুলের বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীতে 'বাঁশের সাঁকো' শীর্ষক জল রং ছবির জন্য প্রশংসিত হন। ছাত্রজীবনের তার উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের স্কেচ, শম্ভুগঞ্জ ঘাট, হাঁস, পল্লীদৃশ্য, জেলে নৌকা, পুল প্রভৃতি। ছবিগুলো হচ্ছে বাস্তবধর্মী। এর মূলে রয়েছে তার

শিশুকালের অভিজ্ঞতা। ব্রহ্মপুত্র নদ, নৌকা, জেলে নৌকা, সাঁকো, পুল, খেয়াঘাট ইত্যাদি দৃশ্যগুলো হচ্ছে তার বাস্তব স্মৃতিরই অংশ। এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে মানুষ হয়েছেন তিনি। এসব চিত্র গ্রামের মানবিক ও নৈসর্গিক চিত্রেরই অংশ। এর সঙ্গে জয়নুল কল্পনার রং যোগ করেছেন।

জয়নুল আবেদিন একান্তভাবেই উপলব্ধি করেছেন, দূর থেকে ঝরা পাতার মর্মর ধ্বনি শোনা যায় না। নৌকা দেখে নৌকার ছবি আঁকা যায় না। নৌকার ছবি আঁকতে হলে নৌকায় চড়া প্রয়োজন। নৌকার দোল না খেয়ে ছবিতে গতি সঞ্চারিত করা যায় না। তাই তার প্রতিটি ছবি জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি নৌকার ছবি আঁকার আগে নৌকায় চড়েছেন। সাঁকোর চিত্র আঁকার আগে সাঁকো দিয়ে পার হয়েছেন। তিনি তন্ময় হয়ে দেখেছেন ব্রহ্মপুত্র নদ। এরপর এঁকেছেন ব্রহ্মপুত্র নদের স্কেচ। তার চিত্রকলার মধ্যে ঘটেছে অভিজ্ঞতার সামাবেশ। ১৯৩৮ সালে জয়নুল আবেদিন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অঙ্কিত কয়েকটি জল রং ছবির জন্য দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত চিত্র প্রদর্শনীতে গোল্ড মেডেল পান। চিত্রগুলোর মাধ্যমে তিনি নিসর্গের রঙের পরিবর্তনকে তুলে ধরেন।

জয়নুল আবেদিনের *দ্বিতীয় পর্বের যাত্রা* শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত চিত্রমালার মাধ্যমে। এ সময় তিনি জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতা দ্বারা দারুণভাবে তাড়িত হয়েছেন। মানবতার লাঞ্ছিত রূপ দেখে মর্মাহত হয়েছেন। ১৩৫০-এর মন্বন্তর জয়নুলের মতো মহান শিল্পী সৃষ্টি করেছে; কিন্তু সমাজকর্মী তৈরি করেনি। তার এসব ছবি সর্বভারতীয় পর্যায় থেকে বিশ্ব পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে। তিনি কালি ও তুলির আঁচড়ে এঁকেছেন দুর্ভিক্ষের ছবি। এসব ছবির প্রতীকচিত্র হিসাবে নারী ও পুরুষের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে কাক, কুকুর, শূন্য থালা, পানির কলসি ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষের ছবিগুলোর শিরোনাম হচ্ছে 'দুর্ভিক্ষ-১৩৫০ বাংলা'। জয়নুল তার ছবিগুলোর শিরোনামে ইংরেজি সন ব্যবহার না করে বাংলা সন ব্যবহার করেছেন। তার সময়ে বাংলা সনের পরিবর্তে ইরেজি সন ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। এর কারণ, ইংরেজদের রাজকার্য পরিচালিত হয়েছে ইংরেজি সন অনুসারে।

জয়নুল আবেদিন সচেতনভাবেই ইংরেজি সনের পরিবর্তে বাংলা সন ব্যবহার করেছেন। বাংলা সন হচ্ছে এদেশের কৃষকের ফসলি সন। আর খাদ্যে স্বনির্ভর বাংলা দেশে খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়নি। দুর্ভিক্ষ হয়েছে ইংরেজ শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট জমিদার, মজুতদার ও ফড়িয়াদের কারণে। এদেশে যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তখনো বাজারে চাল কিনতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কৃষকদের হাতে অর্থ ছিল না বলে চাল কিনতে পারেনি। তাই ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে কৃষক ও দিন মজুর মারা গিয়েছে বেশি। মানব সভ্যতার কলঙ্কজনক এই অধ্যায় শিল্পী জয়নুলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

'দুর্ভিক্ষ-১৩৫০'-এর একটি চিত্রে রয়েছে মায়ের সামনে বসে একটি শিশু শূন্য থালা চেটে খাচ্ছে। অগোছালো চুল নিয়ে মা অর্ধ্ব নগ্ন অবস্থায় বসে আছেন। তাদের পাশে তিনটি কাক। কাকগুলো ঠুকরে খাবার জন্য কিছু পাচ্ছে না। আরেকটি চিত্রে মা ও সন্তানকে দেখানো হয়েছে। সেখানে মা সন্তানের দিকে খালি হাত বাড়িয়ে রেখেছে। অন্য একটি চিত্রে রয়েছে সন্তান কোলে মা এবং একজন পুরুষ ডাস্টবিনের ভেতরের দিকে মাথা নিচু করে আছে। এই চিত্রে রয়েছে নগরের চিহ্ন। আরেকটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে ডাস্টবিনের পাশে শুয়ে আছে একজন অর্ধ্ব নগ্ন মহিলা। তার মুখের উপর এবং হাতের কাছে দুটি কাক। পাশেই ডাস্টবিনের কাছে কুকুর।

শিল্পী জয়নুল আবেদিন তার দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার মাধ্যমে মানুষ, কুকুর ও কাককে একাকার করে দিয়েছেন। অনাহারজনিত কারণে মানবদেহগুলো অতি মাত্রায় দীর্ঘ। তিনি এক্সজারশন ও ডিস্টরশন-এর আশ্রয় নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বাস্তববাদী প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্প্রকাশবাদ বা এক্সপ্রেশনিজম। এক্সপ্রেশনিজমের মূল কথাই হচ্ছে ব্যক্তিগত আবেগ এবং শারীরিক অভিব্যক্তিকে শিল্পীর নিজস্ব শৈলী অনুসারে মূর্ত করে তোলা। এর ফলে শিল্পের প্রচলিত আঙ্গিকের বিপর্যয় ঘটে। তা শিল্পী নিজস্ব উদ্যোগেই ঘটান চিন্তাকে অধিকতরভাবে স্পষ্ট করে তোলার জন্য। জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় খাদ্যের অভাবে মানুষের দেহ দীর্ঘ্য হয়ে গিয়েছে। এর ফলে তাদের উপর যে দুর্ভিক্ষের প্রভাব, তা ভয়াবহভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এতে দর্শকদের মনে ভীতি সঞ্চারিত না হয়ে পারে না।

শিল্পী জয়নুল তার দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার মাধ্যমে মানব জাতির ট্রাজিক পরিণতিকে মূর্ত করে তুলেছেন। এভাবেই শাসকদের নির্দয় আচরণে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। রোমান সভ্যতা নির্মাণ করেছে দাসরা। পরবর্তী সময়ে দাস বিদ্রোহেই রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। শাসকরা যত কঠোর হোক না কেন-ক্ষমতা স্থায়ী থাকে না।

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ ছিল এদেশের মানুষের প্রতি ইংরেজ শাসকদের নির্মম আচরণেরই প্রকাশ। শিল্পী জয়নুল তার কালি ও তুলির মাধ্যমে এই অত্যাচারের কাহিনীকে কালজয়ী শিল্পে রূপ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে জয়নুলের বক্তব্য হচ্ছে "তারপর এলো দুর্ভিক্ষ। আমি কলকাতায় সেই ভয়াবহ দৃশ্যাবলী ধরে রাখতে চাইলাম। চটপট কাজ করতে হয়, তাছাড়া সব জিনিসের দাম চড়া, আমি সস্তা কাগজে, দ্রুত অবিরাম একে গেলাম, শত শত স্কেচ, দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন দৃশ্য। প্রয়োজনের তাগিদে, নেহাত অব্যবস্থার প্রয়োজনে আমার স্টাইল বদলে গেল। এক্সপ্রেশনিস্ট হলাম, খুব সহজ অথচ শক্ত রেখায়। কিছুটা জ্যামিতিক আকৃতির

মধ্যে সে সব দৃশ্য ধরে রাখতে চাইলাম।" এ কারণেই তার দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় শীর্ণকতায় মানবদেহগুলো দীর্ঘ হয়েছে। আর ছবি আঁকার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন সস্তা উপকরণ-'সস্তা কাগজ, কালি ও তুলি'।

জয়নুলের দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার মধ্যে একটি নাগরিক চেহারা রয়েছে। তারই প্রতীক হচ্ছে ডাস্টবিন। হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার আঘাতে মানুষের জীবন ছিন্নভিন্ন। এ কারণেই আবর্জনার ভাঁড়ারই হচ্ছে নগরের প্রতীক। এসব চিত্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে আধুনিক জীবনের আদর্শহীন রূপ। এটা এক ধরনের বাস্তবতাই।

শিল্পকলার জগতে বাস্তববাদী আন্দোলনের মূলে ছিল বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও ভাবালুতা পরিহার। এই আন্দোলনের অগ্রপথিক হচ্ছেন গুস্তাব কুর্বে (১৮১৯-১৮৭৭)। এসব আন্দোলন সম্পর্কে জয়নুল পরিচিত হয়েছেন ছাত্র জীবনে। তাই তিনি প্রথাবদ্ধ, পুরাণ নির্ভর ও ইতিহাস আশ্রিত শিল্প রীতিকে পরিহার করেছেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তার শিল্পের রূপ ও বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে। সেখানেও তিনি চিরায়ত মাতৃত্ব ও নিসর্গের সঙ্গে লোকসংস্কৃতিকে যুক্ত করেছেন। তার 'মা ও শিশু' এবং 'পাইন্যার মা' ছবি দুটিতে রয়েছে চিরায়ত বাংলার মায়ের রূপ। ছবি দুটির অঙ্কনকাল হচ্ছে ১৯৫৩। মাধ্যম গোয়াশ। 'পাইন্যার মা' চিত্রে মায়ের দুটি হাত রাখা হয়েছে চিবুকের নিচে। দুই হাতে দুটি চুড়ি। পটভূমিতে রয়েছে কালো রেখার টান। একজন চিন্তামগ্ন মায়ের রহস্যময় ভাবনার চিত্র ফুটে উঠেছে এই শিল্পকর্মটিতে। একই বছর তিনি জ্যামিতিক ফর্মে এঁকেছেন 'মা' নামে আরেকটি চিত্র। এতে তিনি ব্যবহার করেছেন লাল রং।

১৯৫৪ সালে জয়নুলের আঁকা একটি ছবির নাম হচ্ছে 'জীবন'। কাদায় আটকে গিয়েছে একটি গরুর গাড়ি। দুটি গরু এবং একজন মানুষ গরুর গাড়িটিকে টেনে কাদা থেকে তোলার চেষ্টা করছে। চিত্রকর্মটি এ্যাগ ট্যাম্পারায় আঁকা। এই ছবির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে মানুষ ও পশু শক্তির সমন্বিত ধারণা। এদেশে গরু লাঙল টানে, গাড়ি টানে। এটা বাংলার চিরায়ত রূপ। আর এদেশের মেহনতি মানুষ পশুর মতোই পরিশ্রম করে। কিন্তু তারা উপযুক্ত মূল্য পায় না। একজন ইংরেজ এদেশের লাঙলকে বলেছেন 'পা-লাঙল'। অর্থাৎ তিনি গরুর চেয়ে মানুষের পাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। জয়নুলের 'জীবন' চিত্রে সামনে গরু থাকলেও গাড়িকে কাদা থেকে টেনে তুলছে মানুষ। মানুষের পেশীর শক্তি সরাসরি সঞ্চারিত হয়েছে চাকায়। এই চিত্রকলাটি ভাস্কর্যে রূপ দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভেতরে। দর্শকরা তন্ময় হয়ে ভাস্কর্যটি দেখেন এবং মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্রকে অনুভব করেন। 'জীবন' চিত্রের মাধ্যমে জয়নুল মানুষের মনে মহৎ উপলব্ধি সঞ্চার করেছেন।

১৯৫৪ সালে তার আঁকা 'কলসী কাঁখে বধূ' ভিন্ন ধরনের চিত্র। তিনি এটি এঁকেছেন জ্যামিতিক ফর্মে। এ ক্ষেত্রে কিউবিস্ট ধারাকে অনুসরণ করেছেন তিনি। কিউবিস্ট ধারার শিল্পীরা বস্তুর গঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ কারণেই তারা বস্তুর আকারকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় বিভক্ত করেছেন। তারা বস্তুর ঘনত্বকে রেখা ও রঙের মাধ্যমে বিভক্ত করে দেখেছেন।

কিউবিজমের উত্থানের মূলে রয়েছে পিকাসোর প্রভাব। পিকাসোর তার শিল্পের বস্তুটিকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্বে বিভাজন করে দেখেছেন। এ কারণেই তিনি বস্তুর কাঠামো নির্মাণের সময় জ্যামিতিক উপাদানকে নির্বাচন করেছেন। ১৯৫৪ সালে আঁকা জয়নুল 'গুনটানা' চিত্রকর্মটিতেও বস্তুকে জ্যামিতিক নকশায় বিভক্ত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি তুলে এনেছেন লোকজ জীবনকে। একে দান করেছেন গতি। পেশী শক্তির সঙ্গে লোকজ জীবনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এটা জয়নুল সব সময়ই উপলব্ধি করেছেন।

তিনি রাজশাহী শহরের কাছে সিন্দুরকুসুরী গ্রামের পালপাড়ায় গিয়ে মাদুরে বসে দেখেছেন কুমারদের হাতের কাজ শখের হাঁড়ি আর পুতুল রং করার কৌশল। অভিভূত হয়েছেন কুমারদের তুলির নিপুণ পোচ দেখে। হাঁড়ির গায়ে রঙিন মাছ, পাখি, ঘোড়া ও লতা-পাতার মোটিফ দেখে হাজার বছরের বাংলাদেশের রূপ খুঁজে পেয়েছেন জয়নুল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এঁকেছেন পটুয়ার ছবি। গ্রামীণ মহিলাদের রূপ চর্চার পরিচিতি দৃশ্যকেও তিনি ধরে রেখেছেন তুলির আঁচড়ে। এ ধারার দুটি ছবি হচ্ছে 'প্রসাধন'। দুটি চিত্রে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করেছেন। চিত্র দুটি অঙ্কনের ক্ষেত্রে লোকজ রীতির সঙ্গে কিউবিজমের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। দুটি চিত্রের মধ্যে একটি তেল রং আর আরেকটির মাধ্যম হচ্ছে গোয়াশ। গোয়াশ মাধ্যমে আঁকা 'দুই বোন'-এর ক্ষেত্রেও একই রীতির ব্যবহার করেছেন। দুই বোন চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে উজ্জ্বল লাল ও গাঢ় কালো রং। এর পেছনে রয়েছে হালকা নীল রং এবং ছোট ছোট পাতার মোটিফ। কিউবিক রীতিতে রঙিন কালিতে আঁকা 'বাঙালি কুমারী' চিত্রে ব্যবহার করেছেন পার্পল রং। এ ধরনের রং সাধারণ প্রকৃতিতে দেখা যায় না। এটি একটি আর্টিফিসিয়াল রং। এর সঙ্গে মিশিয়েছেন নীল। মহিলার মুখ ও গলা আঁকার জন্য ব্যবহার করেছেন নমনীয় হলুদ। কুমারীর চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য এটি যথার্থ রং। এক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করেছেন।

পাকিস্তান আমলে জয়নুলের নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনের একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। তিনি এসব ছবির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার লোকজ জীবনের চিত্র তুলে এনেছেন। এসব ছবির মধ্যে রয়েছে গুনটানা', 'বিদ্রোহী' 'গরু', 'মই দেয়া', 'সংগ্রাম' ইত্যাদি। ১৯৫১ সালে আঁকা 'বিদ্রোহী' ছবিতে দেখা যায় একটি

দুগ্ধবতী গাভী দড়ি টেনে ছেঁড়ার জন্য প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করছে। গাভীটি বেশ মোটা তাজা। এটি বিদ্রোহী বাংলারই প্রতীক।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রে ঘুরে ফিরে এসেছে মায়ের প্রতিকৃতি। তার মা কখনো দুর্ভিক্ষ পীড়িত। আবার কখনো বা কোমল। সম্ভবত তাকে সাঁওতালদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে সাঁওতালদের কঠিন-কোমল রূপ। এর প্রমাণ রয়েছে তার 'সাঁওতাল', 'একজন উপজাতি', 'দুইটি উপজাতীয় মেয়ে', 'উপজাতীয় রমণী' ইত্যাদি চিত্রে। তিনি উপজাতীয় রমণীদের চেহারায় ফুটিয়ে তুলেছেন মাতৃত্ব সুলভ কমনীয়তা। মা ও রমণী একই নারীর ভিন্ন রূপ। শৈশব ও কৈশোরে মেয়ে, তারুণ্যে স্ত্রী এবং এরপর মা-এই তিন ভিন্ন রূপে বাঁধা পড়ে আছে নারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দিশাহারা নয়। সকল অবস্থায় রয়েছে তার কোমল রূপ। এই রূপের মহিমা-ই তুলে ধরেছেন জয়নুল। এতে শুধু রঙের ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন। রঙের ভাষা বির্মূত। শিল্পী তার ছবির মাধ্যমে রঙের ভাষা মূর্ত করে তোলেন। সাত সুরে যেমন বাঁধা পড়ে কোটি জনতার সুর, তেমনি সাত রঙে বাঁধা পড়ে নিসর্গ ও মানুষের সর্বব্যাপ্ত রূপ। জয়নুল তার বর্ণনামূলক চিত্রগুলোর মাধ্যমেও কাব্যিক আবেদন সৃষ্টি করেছেন।

জয়নুলের চিত্রকলায় দৃশ্যগুণ রয়েছে, যার ফলে ছবিগুলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। শিল্প কি? শিল্প সম্পর্কে এ ধরনের একটি প্রাচীন জিজ্ঞাসা রয়েছে। অনেকেই শিল্পকে নন্দন তত্ত্বের নিরিখে দেখেছেন। যারা সমাজ গঠনের মহৎ উপাদান হিসাবে শিল্পকে দেখেছেন, তাদের কাছে এ তত্ত্ব গৃহীত হয়নি। যারা মানব সভ্যতাকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় রূপান্তরের চেষ্টা করেছেন, তাদের কাছে শিল্প হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। তবে তারা শিল্পের মান বিচারের সময় এর নন্দন তাত্ত্বিক দিকের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন। জার্মান দার্শনিক গ্যাডামার তার 'দি রেলিভেন্স অফ দি বিউটিফুল' প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, বাইরে থেকে দেখে শিল্পকে ব্যাখ্যা করা হলে তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

একটি ফুল কিংবা পাখি সুন্দর। এটি হচ্ছে বস্তুর বাইরের সত্ত্বা। তেমনি 'হাঁস'। জয়নুল 'হাঁস' এর ছবিও এঁকেছেন; কিন্তু তা নিছক বস্তু নির্ভর সৌন্দর্য নয়। এর একটি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য রয়েছে। এ ধরনের আরো উদাহরণ হচ্ছে কালি ও তুলিতে আঁকা 'সাপুড়ে' (১৯৭২) কিংবা এ্যাক্রোলিক মাধ্যমে আঁকা 'বিশ্রাম' (১৯৭২) শিল্পকর্ম। 'সাপুড়ে' চিত্রে ঝুড়ি মাথায় দুজন সাপুড়ে মহিলার ছবি এঁকেছেন তিনি। একজন মহিলার ছবি এঁকেও সাপুড়ের অর্থ বুঝাতে পারতেন। কিন্তু কর্মজীবী মহিলাদের মধ্যে একটি প্রশান্ত ভাব আনার জন্য দুজন সাপুড়ের চিত্র এঁকেছেন। এতে রঙের সঙ্গে বস্তুর ছান্দিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

'বিশ্রাম' চিত্রেও দুজন মানুষের ফিগার ব্যবহার করেছেন। কোনো সময়েই মানুষের একা নয়। বিশ্রামের সময়ও মানুষের সঙ্গে আছে মানুষ।

জয়নুলের চিত্র প্রকৃতি ও মানবনির্ভর। তিনি রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে লোকজধারাকে অনুসরণ করেছেন। তবে কিছু বিমূর্ত ধারার ছবিও এঁকেছেন। যেমন- 'একুশে ফেব্রুয়ারি', 'জলোচ্ছ্বাস', 'জলোচ্ছ্বাসের শিকার' 'কাল বৈশাখী ঝড়' ইত্যাদি। এক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিন প্রকাশবাদী কিংবা বাস্তববাদী নন। বরং অস্পষ্ট ফিগার ও রঙের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি কখনই বিমূর্ত ধারার শিল্পী নন। জয়নুল তার বিমূর্ত বিষয়কে প্রকাশের জন্য প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন- কালো ও মোম মাধ্যমে আঁকা 'ঝড়ে গরু' কিংবা 'ক্রুদ্ধ ষাড়'। ঝড়ে পতিত গরুর ছবি আঁকার সময় জয়নুল ব্যবহার করেছেন দুগ্ধবতী গাভীর চিত্র। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে উৎপাদকরাই সব সময় বিপদগ্রস্থ হয়। তিনি কালি ও কলমের মাধ্যমে যেভাবে ক্রুদ্ধ ষাড়ের ছবি এঁকেছেন, তাতে তার ড্রয়িং-এর শক্তিও প্রকাশিত হয়েছে। এই চিত্রটি দেখতে দেখতে মনে হয়, এদেশের মানুষের মনে সঞ্চিত স্বাধীনতা লাভের স্পৃহার কথা। যারা লোকজ ঐতিহ্য নির্ভর ছবি আঁকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চান, তারা জয়নুলের ছবি দেখলেই অনুধাবন করতে বাধ্য হবেন, যে কোনো রীতিতে আঁকা চিত্রই আন্তর্জাতিক ভাষা অর্জনে সক্ষম। তাই জয়নুল আবেদিন শুধু শিল্পী নন, শিল্পাচার্য।

অনেক আধুনিক কবি ও শিল্পীদের মধ্যে মৃত্যুচেতনা একটি প্রধান বিষয়। রেইনার মারিয়া রিলকের 'সনেটস টু অর্ফিউস' কবিতাগুচ্ছে মৃত্যু চেতনার উপস্থিতি রয়েছে। এলিয়টের কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মৃত্যু চেতনার কাতরতা ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দের কবিতায় দেহকে অবলম্বন করে মৃত্যুবোধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পী জয়নুলের ছবিতে মৃত্যুর উপস্থিতি রয়েছে কঠোর বাস্তবতার পটভূমিতে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ক চিত্রমালার মধ্যে সেই অনুভূতি ফুটে উঠেছে। তার এসব ছবি বর্ণনামূলক নয়। বরং প্রতীক আশ্রিত। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এক্সপ্রেশনিস্ট লেখক গটফ্রিট বেন 'লাশকাটা ঘর' নামে একটি পেমপ্লেট লিখে হৈচৈ ফেলে দেন। এর মাধ্যমে তিনি যুগজ্বরকে তুলে ধরেন। এর সঙ্গে যুক্ত করেন উচ্চ গতি। শেষ পর্যন্ত ফিউচারিস্টরা এই যুগজ্বর ও উচ্চ গতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। আর এক্সপ্রেশননিস্টরা গ্রহণ করেন যুগের বিকৃতিকে। তারা ঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে কবিতায় রূপ দিতে উদ্যোমী হন। দর্শকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টির জন্য শিল্পীরা এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেন। এর কারণ, শিল্পীরা না বলা কথার মধ্যে বলার অনুভূতি সৃষ্টি করতে চান। এর ফলে দর্শকরা বাস্তবের জগত থেকে পরাবাস্তবের জগতে প্রবেশ করে এবং বাস্তবের অস্তিত্বে কল্পনার রং

লাগায়। যেমন জয়নুলের কালো কালির মাধ্যমেই আঁকা 'যুগল রমণী', 'মুক্তিযোদ্ধা', প্যাস্টেল ও কালির মাধ্যমে আঁকা 'কুমারী', তেল রঙের 'চারমুখ', কলম ও কালির মাধ্যমে আঁকা 'ক্রুদ্ধ ষাড়' ইত্যাদি চিত্রে বাস্তবতার স্পর্শ রয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে শিল্পী জয়নুল দর্শকদের কাল্পনিক বাস্তবতায় টেনে নিয়ে গিয়েছেন। এসব চিত্র পরাবাস্তব শিল্পকর্মের মধ্যে পড়ে না। তা ছাড়া জয়নুল তার শিল্পে পরাবাস্তবতার রীতিকে গ্রহণ করেননি।

তিনি দেশজ রীতির সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিষয়কে শিল্পের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের শিল্পকর্মের সংখ্যা নিছক কম নয়। এসব চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে কলম ও কালির মাধ্যমে আঁকা স্কেচ 'জর্ডান ও কায়রো', কালির মাধ্যমে আঁকা 'প্যালেস্টাইন', কালির মাধ্যমে আঁকা 'একজন প্যালেস্টাইন রমণীর প্রতিকৃতি' ইত্যাদি। চিত্রগুলো গভীর উপলব্ধির স্মারক। সম্ভবত : তাকে এসব চিত্র আঁকতে তাড়িত করেছে আবেগ জনিত অভিজ্ঞতা। এর মাধ্যমে মুক্তিকামী মানুষের প্রতি তার সমর্থনও অভিব্যক্ত হয়েছে।

জয়নুলের বেশ কিছু সাধারণ স্কেচ রয়েছে। এসব স্কেচের মাধ্যমে তার ড্রয়িং-এর শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- নারী, শিশু, শকুন এবং বিদেশের বিভিন্ন শহরের স্কেচ। এসব স্কেচে রয়েছে সৃষ্টির অপূর্ব লাবণ্যপ্রভা। শিল্পী জয়নুল শুধু চারুশিল্পী নন, তার চারুশিল্পে রয়েছে জীবন ও সৌন্দর্যের দর্শন। এ কারণে তার বিষয়বস্তু ও উপকরণ নির্বাচনে দর্শনের ছাপ রয়েছে।

শিল্পকর্মে সৌন্দর্য সৃষ্টি ছাড়াও যেসব বিষয় স্থান পায়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার শৃঙ্খলা। এ কারণে সত্যের অনুসন্ধান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও শিল্পীর কাজ। কিন্তু শিল্পী জয়নুলের জন্য তা রাজনৈতিক ইস্যুর মতো তাৎক্ষণিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। শিল্পী জয়নুল ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পরও তার চিত্রের আবেদন শেষ হয়ে যায়নি। 'ক্রুদ্ধ ষাড়' কিংবা 'ঝড়ের মধ্যে গরু'-এই ধারারাই চিত্রকর্ম। মোগল স্থাপত্য কলা জয়নুলকে প্রভাবিত করেছে। সে কারণেই তিনি এঁকেছেন মসজিদের চিত্র। মসজিদের চিত্র আঁকার সময় তিনি নির্মোহ থেকেছেন। এসব চিত্রের ফিগার ও রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাস্তব রীতি অনুসরণ করেছেন। তার একটি মসজিদের চিত্রে রয়েছে তিনটি গম্বুজ এবং মসজিদের পাশে নারকেল গাছের ডাল। মসজিদের সঙ্গে মিনারে উঠার সিঁড়িও যুক্ত করেছেন তিনি। মসজিদ আঁকার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন লাল রং। এই রঙের মধ্যে রয়েছে একটি কোমল ভাব।

১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা জয়নুলের চিত্রকর্মে নেই বললেই চলে। তবে তিনি

চিরায়ত বাংলার লোকশিল্পের প্রতি নিবিড়ভাবে ঝুঁকে পড়েন এবং একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ ব্যাপারে তিনি তাদের সহযাত্রীদেরও সহযোগিতা চান। কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। এ কারণে তিনি বাধ্য হয়েও সরকারি উদ্যোগে গঠন করেন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর।

বাংলাদেশে স্বাধীন হবার পর পরই তিনি একটি স্ক্রল চিত্র আঁকেন। চিত্রটি ৬৫ ফুট দীর্ঘ। এই স্ক্রল চিত্রটিতে রয়েছে বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিনচিত্র। তিনি স্ক্রলটির মাধ্যমে কোনো গল্প বলার চেষ্টা করেননি। বরং লোকসমাজের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। এতে চিরায়ত বাংলার একটি রূপ ফুটে উঠেছে। সম্ভবত : তিনি এ ধরনের স্ক্রল অঙ্কনের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন নন্দলাল বসুর কাছে। নন্দলাল ১১৪ সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি হাল কর্ষণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। পরে তা দেয়ালে উৎকীর্ণ হয়েছে। পটচিত্র বা স্ক্রল পেইটিং লোকশিল্প হিসাবেই পরিচিত। একসময় গ্রামের শিল্পীরা তা আঁকতেন। মোটা কাপড়ের উপরে আঁকা পটচিত্র 'গাজীর পট' খুব বিখ্যাত ছিল। গ্রামীণ শিল্পীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে পটচিত্র দেখাতেন এবং গানের সুরে সুরে কিংবা গল্প বলার ঢঙে তা গ্রামের দর্শকদের বুঝাতেন। সেই সংস্কৃতি অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই ধারাকে আধুনিক চিত্রকলায় তুলে এনেছেন জয়নুল।

আধুনিক কালে পটচিত্রে কাহিনীর পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে মনোরম দৃশ্য। সুন্দর গাছ, পাখি কিংবা অন্য কোনো দৃশ্য; সঙ্গে শিল্পীর হাতের লেখা। এভাবেই পটচিত্র আধুনিক চিত্রকলায় উন্নীত হয়েছে।

জয়নুল আবেদিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক শিল্প সংগ্রহও করেছেন। এসব লোকশিল্পের মধ্যে রয়েছে নকশী কাঁথা, দারুশিল্প, শখের হাঁড়ি, বিচিত্র রঙের পতুল ইত্যাদি। তিনি এসব লোকশিল্পের রূপকল্প তার চিত্রকর্মে ব্যবহার করেছেন। তিনি কাগজে তেল রঙে এঁকেছেন সোনারগাঁয়ের চিত্রিত 'কাঠের ঘোড়া' কিংবা 'কুটির'। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছেন বিচিত্র রকমের নৌকা। এসব নৌকা তিনি এঁকেছেন প্রকাশবাদী শিল্পীর দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে। আবার কখনো ব্যবহার করেছেন ইমপ্রেশনিজম রীতি। তার একটি ছবির নাম 'নদীর ধার'। এই চিত্রে অনেকগুলো নৌকা রয়েছে। কিন্তু নৌকাগুলো খালি। কোনো মানুষে নেই। এ ছবির মাধ্যমে জয়নুল একই ধরনের কয়েকটি নৌকার সম্মুখ ভাগ তুলে ধরেছেন। নৌকাগুলো এঁকেছেন ইম্প্রেশনিজম রীতিতে। আরেকটি চিত্রের নাম 'মৎস্য শিকার'। জলরঙে আঁকা চিত্রটি বাস্তবধর্মী। এই চিত্রে নৌকায় করে জেলেদের মাছ ধরার কর্মযজ্ঞকে দেখানো হয়েছে।

প্রাচীন এথেন্সে নৈসর্গিক চিন্তার যে স্ফুরণ ঘটে তা পরবর্তী সময়ে রোমান সভ্যতা নির্মাণে ব্যাপক অবদান রাখে। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে রোমান সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হন। পরবর্তী সময় হূণ, জার্মান ও ভাইকিং দস্যুদের আক্রমণে রোমান সভ্যতা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। রোমান সভ্যতা ধ্বংসের মূলে রয়েছে জাতি ভেদ, অসাম্য, হেলেনিক জীবনবোধের অভাব এবং ঘন ঘন দাস বিদ্রোহ।

হেলেনিক জীনবোধের মূল শক্তি ছিল যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের প্রাধান্য। আর মানবিক কল্যাণ ছিল এর মূল আদর্শ। কিন্তু রোমানরা ধর্মের নিগড়ে বন্দি ছিল। সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০) মানুষের আত্মনিগ্রহকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলতেন, আদমের পতনসূত্রে মানুষ পাপগ্রস্ত। তাদের ন্যায় সঙ্গত শাস্তি হচ্ছে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করা। কোনো উপায়ে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বরের দয়ায় কোনো কোনো ব্যক্তি স্বর্গে স্থান পান। সে সময় এ ধরনের নিয়তিবাদের প্রভাবে মানুষ বিপন্ন বোধ করত এবং নতুন আলোর সন্ধান করত। এর ফলে মধ্যযুগে ধর্মবিশ্বাস এবং যুক্তিবাদী দর্শনের সঙ্গে সংঘাত উপস্থিত হয়। এই সংঘাত ধীরে ধীরে নতুন বিশ্ব সৃষ্টির চিন্তাকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। চতুর্দশ শতক থেকে ইউরোপে যুক্তির প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। প্রথমে এই নব জাগরণের সৃষ্টি হয় ইতালিতে। পরবর্তী সময়ে তা ছড়িয়ে পড়ে জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যান্ডে। একেই বলা হয় রেনেসাঁস। রেনেসাঁসের প্রথম প্রবক্তা কবি পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪)। তার সময় থেকে পরবর্তী তিনশত বছর পর্যন্ত এর প্রভাব চলতে থাকে। এ সময়ের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ভ্যান আইক (১৩৮৫-১৪৪০), উচ্চেলো (১৩৯৭-১৪৭৫), বতিচেল্লী (১৪৪৪-১৫১০), লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)', ডুয়েরার ২৪-৭১-১৫২৮), মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪), টিশিয়ান (১৪৭৭-১৫৭৬), রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০), ইলবেন (১৪-৯৭-১৫৪৩), এল গ্রেকো (১৫৪৫-১৬১৪), রুবেন্স (১৫৭৭-১৬৪০) প্রমুখ। তাদের চিত্রকলা সারা বিশ্বকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।

রেনেসাঁসের শিল্পীরা একই বিশ্বে বসবাস করেও তাদের মধ্যে বিচিত্র রকমের চিন্তা ছিল। তবে তাদের চিন্তার মূল বিষয় ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব এবং মানবতন্ত্র। এই যুগের শিল্পীরা জীবনের সব আদর্শের চর্চা করেছেন। ফলে নানা বিবর্তন এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প, শিল্পকলা ও সাহিত্য, শিক্ষা ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রচিন্তা, আদর্শ ও নীতিবোধ সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বাঙালি চিন্তাবিদদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, মীর মশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলামসহ আরো অনেকের মধ্যেই নতুন চিন্তার স্ফুরণ ঘটে। এমনকি আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে লোকশিল্প সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

ভারত উপমহাদেশে আধুনিক শিল্পকলার উদ্বোধন ঘটে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়। তিনিই প্রথম ভারতীয় শিল্পকলা এবং পাশ্চাত্য শিল্পকলার মধ্যে সমন্বয় ঘটান। তার চিত্রকলার প্রধান বিষয় ছিল পুরাণকাহিনী, বৌদ্ধ দর্শন, ল্যান্ডস্কেপ, ব্যঙ্গচিত্র, দৈনন্দিন জীবন ইত্যাদি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর নন্দলাল বসু নতুন ধরনের শিল্প মেজাজের জন্ম দেন। তিনি তার চিত্রকর্মে গুহাচিত্রের সঙ্গে ভারতীয় পটচিত্রের মিশ্রণ ঘটান। তার চিত্রকলার বিষয় বস্তু ছিল দেবদেবী, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সাঁওতাল সম্প্রদায়সহ আরো অনেক লোকজ বিষয়। তার সময়ে স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন অসিত হালদার, মুকুল দেহসহ অন্যান্য শিল্পীরা। নন্দলাল বসুর পর সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী শিল্পী হচ্ছেন যামিনী রায়। তার কাজ হচ্ছে দ্বি-মাত্রিক। তার শিল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে গরু, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, হরিণ, মা ও শিশু যীশু খ্রিস্ট, ল্যান্ডস্কেপ প্রভৃতি। তাদের সময়ের আরেকজন বিখ্যাত শিল্পী হচ্ছেন আবদুর রহমান চুঘতাই। তিনি ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে পারস্য ও মোগল শিল্প রীতির সংমিশ্রণ ঘটান। বিশ্ব শিল্পের ইতিহাসে তার শিল্পকর্ম মাস্টারপিস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই কয়েকজন শিল্পীর পরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হচ্ছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। সমস্ত বাংলাদেশই হচ্ছে তার শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু। তিনি স্বাধীকার আন্দোলনের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর। তিনি উনিশ শ' সত্তরের নির্বাচনের জলোচ্ছ্বাস নিয়ে এঁকেছেন স্ক্রল পেইন্টিং 'মনপুরা'। এর মাধ্যমে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের ভয়াবহতা মূর্ত করে তুলেছেন। উপকূলীয় মানুষের মহাদুর্যোগকে চিত্রিত করার জন্য ব্যবহার করেছেন লোকজ রীতি। কিন্তু চিত্র এঁকেছেন আধুনিক ভঙ্গিতে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লোকশিল্প নিয়ে অভিজাত সমাজ ভাবতে শুরু করে। লোকশিল্পের উপাদান ও শৈলীকে আধুনিক রীতিতে প্রথম প্রয়োগ করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু তা নিয়ে তিনি বেশি গবেষণা করেননি। নন্দলাল বসু লোকশিল্পের মধ্যে অনেক বেশি প্রাণস্পন্দন অনুভব করেন। তার 'হরিপুরা চিত্রমালা' লোকশিল্পের প্রভাবজাত শিল্প সৃষ্টির জ্বলন্ত উদাহরণ। যামিনী রায় একে আরো বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন। জয়নুল লোকশিল্প সংগ্রহ করে সেগুলো থেকে মোটিফ প্রয়োগ করেন। তার প্রয়োগ রীতিতে রয়েছে জ্যামিতিক নক্শা। অর্থাৎ তিনি লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হলেও আধুনিক জীবন বোধ দ্বারা তাড়িত হন। এর কারণ শিল্পী জয়নুল যেমন প্রাচ্য শিল্পরীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তেমনি পাশ্চাত্যের শিল্পরীতি তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি আধুনিক জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শৈশব স্মৃতি যুক্ত করেছেন।

নন্দলাল তার চিত্রে যে ভূ-প্রকৃতি ধারণ করেছেন, তা মূলত শুষ্ক। কিন্তু জয়নুলের ভূ-প্রকৃতি আর্দ্র। তাই তার ছবির উপাদান হিসাবে এসেছে মই টানা কিংবা কাদায় আটকে যাওয়া গরুর গাড়ি। একই ভাবে এসেছে নদীতে মাছ ধরার দৃশ্য কিংবা নদীর তীরে নৌকা বাঁধার দৃশ্য। তার চিত্রে গ্রামীণ সংসারের চিত্র ঘুরে ফিরে এসেছে। যেমন, হুক্কায় ধূমপান, হুক্কা টানা, রাস্তার ধারের বাড়ি, প্রসাধন, পরিবার ইত্যাদি। তিনি গ্রামের দৃশ্য এঁকেছেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। এসব চিত্রের মধ্যে রয়েছে নিসর্গ, দুই ব্যক্তির মাছ ধরা, নৌকার সারি ইত্যাদি। শৈশব থেকেই এসব দৃশ্য জয়নুলের মনে গেঁথেছিল। সেই স্মৃতিকেই তিনি রঙের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যে সব ঘটনা খুবই সাধারণ। কিন্তু তাতে মানুষের অন্তর্মুখী চেহারা মূর্ত হয়ে ওঠে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্টাডিতে ধরা পড়েছে অনেক অসাধারণ মুহূর্ত। তিনি এঁকেছেন জুতো পরা পায়ের অংশ। জুতোর নিচেই রয়েছে নিষ্পেষিত মানুষ। জয়নুলের আরো অন্তর্মুখী চিত্রের মধ্যে রয়েছে অধ্যয়ন, দুঃখ, চিন্তা, বংশীবাদক ইত্যাদি। এসব ছবিতে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ছবিগুলোর প্রতীকার্থ অন্তর্মুখী অনুভাবনার মাধ্যমে বুঝে নিতে হয়। চিত্রগুলোতে নাগরিক চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। একই সঙ্গে জয়নুল তার ছবির মাধ্যমে নগরের চেহারাও তুলে এনেছেন। যেমন, রেশন দোকান, বাড়িওয়ালী, গৃহ-সামনের দৃশ্য, ঘাট, মোটর গাড়ি ইত্যাদি। তিনি নাগরিক জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলো দেখেছেন গভীর দৃষ্টিতে। কিন্তু নৈঃসঙ্গ্যের গভীরে প্রবেশ করেননি। কিন্তু চিত্রগুলো দৃঢ় টানে আঁকা; কিন্তু গঠন প্রকৃতিও দৃঢ়।

জয়নুল সব সময়ই মানুষকে শ্রদ্ধাবনত চোখে দেখেছেন। এ কারণেই তার চিত্রগুলো জীবন্ত। তার 'চিন্তা' কিংবা 'দুঃখ' চিত্র সহজবোধ্য। কিন্তু এর একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। ছবি দুটির মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখার দুর্লভ অনুভূতি রয়েছে। প্রতিটি মানুষই অফুরন্ত রহস্যের আধার। কাউকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। অন্যকে বোঝার জন্য নিজের উপলব্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন রয়েছে। তার 'যুগল রমণী' চিত্রটি কালো কালিতে আঁকা। চিত্রটি তিনি জ্যামিতিক রীতিতে এঁকেছেন। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে গভীর রোমান্টিকতা। অথচ কালি ও ওয়াশ মাধ্যমে আঁকা জলোচ্ছ্বাস ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছে বিপর্যস্ত মানুষের ট্রাজিক চিত্র। চিত্রটি 'উনিশ' সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের সীমা অতিক্রম করে তা কালজয়ী হয়েছে। এই চিত্রটি দেখলেই মনে হয় উপকূলীয় মানুষের দুর্যোগময় দিনের কথা। 'মুক্তিযোদ্ধা' চিত্রটির ফ্রেম ভেঙে প্রবেশ করেছে সেই কাল রাতের ভয়াবহ দৃশ্যগুলো। লাশের স্তূপের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যখন শিশুরা কাঁদছিল, তখনই হানাদার বাহিনীর

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা। জয়নুলের 'মুক্তিযোদ্ধা' চিত্রটি দেখতে দেখতে আমরা ফিরে যাই পেছনের দিকে। আমরা স্মৃতির দর্পণে দেখতে পাই একটি প্রতিবাদী জাতির চেহারা। আর বিপদগ্রস্ত দিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা। তাই জয়নুলের মুক্তিযোদ্ধা চিত্রটি শুধু একটি মহান চিত্রকলাই নয়, বাংলাদেশের জনগণের ইতিহাসের অংশ।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জীবিত অবস্থায় অনেক অবমূল্যায়নের শিকার হয়েছেন। তাকে তাচ্ছিল্য করে কেউ বলেছেন পল্লীশিল্পী। মূলত : তিনি ছিলেন একজন আধুনিক শিল্পী। আধুনিক শিল্পের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার চিত্রে। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন রোমান্টিক, ক্লাসিক ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী। রেনেসাঁসের সময়েও দেখা গিয়েছে যারা আধুনিক শিল্পের সাধনা করেছেন, তাদের চলার পথে বিস্তর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এর মূল কারণ, অধিকাংশ মানুষের মন মধ্যযুগীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। তাদের জীবনে যুক্তি ও জ্ঞানের চেয়ে অন্ধভক্তি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। শিল্পীদের মনের বিপ্লব সাধিত হলেও সমাজ সংগঠন ছিল জড়বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন। বাংলাদেশের সমাজ বিকাশের পর্বেও মুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অভাব ছিল। আর রাষ্ট্রের কাছে কেন্দ্রীভূত ছিল ক্ষমতা। ফলে সাধারণ মানুষ পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সাধারণ মানুষের চিত্র আঁকতে গিয়েই সমালোচনার শিকার হন। মূলত : তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক শিল্পী, যার চিন্তা ও মননে ছিল মানবতন্ত্র ও মুক্ত চিন্তার আদর্শ। তিনি এই মননশীলতাকে ব্যবহার করতে গিয়েই লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। আর তার কালজয়ী হবার পেছনে এসব উপাদানেরই প্রাধান্য রয়েছে।

জয়নুল আবেদিন ঢাকা নগরে প্রতিষ্ঠা করেন চারুকলা ইনস্টিটিউট। সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত লোকশিল্প জাদুঘরের তিনিই পরিকল্পক। পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্ট বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন তিনি। তার প্রচেষ্টায় করাচিতে আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এত কিছু করার পরও চিত্র অঙ্কনে ছেদ পড়েনি তার। বিদেশে ঘুরে ঘুরে জাদুঘরে দেখেছেন কালজয়ী শিল্পীদের শিল্পকর্ম। আয়ত্ত করেছেন সৃষ্টিশীলতার অন্তর্নিহিত শক্তি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর চলে আসেন বাংলাদেশে। তার সঙ্গে আসেন কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমীন, মোহাম্মদ কিবরিয়া প্রমুখ। জয়নুলের মতো কামরুল হাসানও লোকশিল্প থেকে তার শিল্পকর্মের উপকরণ সংগ্রহণ করেছেন। তিনি এই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন পিকাসোর কাছ থেকে। শিল্পী পাবলো পিকাসো আফ্রিকার বেনিনদের থেকে ধাতু ঢালাই ও কাঠশিল্প দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তার শিল্পকর্মে ব্যবহার করেছেন সে সব কারুপণ্যের দৃঢ় কর্ম, নকশা ও রং। কামরুল হাসানও তার শিল্পকর্মের উপাদান

সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশের পটুয়াদের কাছ থেকে। বাঙলার লৌকিক মোটিফ, মাটির পুতুল, লক্ষ্মীর সরা, সোনারগাঁয়ের চিত্রিত ঘোড়া, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি তাকে প্রভাবিত করেছে। তার শিল্পকর্মে স্থান পেয়েছে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠান। তার লোকজ চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে 'নাইওর', 'তিনকন্যা', 'মাদল-নৃত্য' ইত্যাদি চিত্রে। 'নদীর ঘাটে ওঠা-নামা', 'গোসল করা', 'কলসি কাঁখে পানি নেওয়া' প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে কামরুল হাসানের চিত্রে। তার এসব শিল্পকর্মে লোকশিল্পের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই অনুপ্রেরণা তিনি জয়নুলের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

এদেশের শিল্পীদের মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তারা লোকজ ধারাকে ত্যাগ করতে পারেননি। এ ব্যাপারে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের প্রভাব পড়েছে বেশি। জয়নুলের চিত্রকর্ম কল্পনাশ্রীয় নয়; বরং বাস্তবতার অনুগামী। যেমন মাইকেল এঞ্জেলো কিংবা ভ্যান গঁগ। শিল্পী সফিউদ্দীন প্রথম জীবনে বাঙলার গ্রামীণ নিসর্গ ও মানুষকে নিয়ে ছবি এঁকেছেন। পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্য রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে লোকশিল্পকে রহস্যময় অভিব্যক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এর জ্বলন্ত উদাহরণ 'মাছ', 'মাছ ধারার জাল' 'বাতিল নৌকা', 'চোখ' 'কম্পোজিশন' প্রভৃতি। তিনি সাঁওতালদের জীবনকে ছাপচিত্রে ব্যবহার করেছেন। এসব বিষয় জয়নুল আবেদিন আগেই ব্যবহার করেছেন।

জয়নুলের চিত্রে রয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ। এ কারণেই তার আঁকা উপজাতীয় রমণীদের চিত্রে ফুটে উঠেছে অসামান্য কমনীয়তা এবং লাবণ্যের প্রভা। বাংলাদেশের চিত্রকলায় লিওনার্দো দা ভিঞ্চির প্রভাব রয়েছে। এর কারণ তিনি ছিলেন রেনেসাঁস যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্পী। লিওনার্দো একই সঙ্গে ছিলেন শিল্পী, আবিষ্কারক ও বিজ্ঞানী। তার শিল্পকর্মে রয়েছে আঙ্গিক ও রঙের সূক্ষ্ম ব্যবহার। তার আঁকা নারীর প্রতিকৃতির মধ্যে রয়েছে এক ধরনের প্রশান্ত ভাব। তিনি ধর্মীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ফলে তার আঁকা মা ও শিশুর রূপের মধ্যে রয়েছে স্বর্গীয় অনুভূতি। তিনি এঁকেছেন নারীর প্রতিকৃতি কিংবা হাতের চিত্রকল্প। এতেও রয়েছে রং ব্যবহারের কমনীয়তা।

কাঠের উপর তেল রঙে আঁকা তার একটি চিত্রের নাম হচ্ছে 'ফুলদানিসহ মা ও শিশু'। এই চিত্রের রয়েছে গাঢ় লাল, কালো ও হলুদ রঙের ব্যবহার। ফুলদানিটি পুরোপুরি মূর্ত নয়। বিমূর্তও নয়। হাতের লাল রঙের সঙ্গে সংহতি রেখে আঁকা হয়েছে লাল রঙের ফুল। কিন্তু মাথা নিচু করে রাখা একজন মহিলার স্কেচ এঁকেছেন হালকা হলুদ ও কালো রঙে। কোথাও কোনো গাঢ় রঙ ব্যবহার করেননি। এই দুটি চিত্র পাশাপাশি দেখলে কখনোই মনে হয় না মা ও শিশুর ছবি আঁকার জন্য গাঢ় রং ব্যবহার করেছেন। শিল্পী জয়নুল আবেদিনের মধ্যে

লাল রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে লিওনার্দো প্রভাব রয়েছে। তিনিও মা ও শিশুর ছবি এঁকেছেন। তাতে গাঢ় লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করেছেন। লিওনার্দো মা ও শিশুর ছবি এঁকেছেন প্রকাশবাদী রীতিতে। কিন্তু জয়নুলের মা ও শিশু ছবিটি কিউবিক রীতিতে আঁকা। লিওনার্দোর আঁকা কাঠের উপর তেল রঙে আঁকা মোনালিসা চিত্রেও ব্যবহার করেছেন গাঢ় রং। কালো ও হলুদের অপূর্ব সমন্বয়ে মোনালিসা চিত্রটি এঁকেছেন তিনি। অথচ চিত্রের মধ্যেও রয়েছে কমনীয়তার রহস্যময় অনুভূতি। মোনালিসার চোখের দৃষ্টি এবং হাতের উপর হাত রাখার ভঙ্গিটি হচ্ছে অপূর্ব। তার পরনের পোশাকেও রয়েছে রহস্যময়তা। এই কালজয়ী প্রতিকৃতিটি প্রত্যেক শিল্পী ও দর্শককে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের সময় জয়নুলের উপর মোনালিসার প্রভাব পড়েনি। মোনালিসার প্রতিকৃতিতে রয়েছে আভিজাত্য। আর জয়নুলের নারীর প্রতিকৃতিতে রয়েছে মধ্যবিত্ত সুলভ আবেগ। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে পিকাসোর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এর কারণ তিনি পৃথিবীর নির্যাস তুলে এনেছেন রঙের মাধ্যমে। তিনি তার মায়ের প্রতিকৃতি (১৮৯৬) এমন কমনীয়ভাবে এঁকেছেন, তাতে তার টেকনিকের দক্ষতাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাদা সংমিশ্রিত সবুজ ক্যানভাসের অঙ্কিত চিত্রে ব্যবহার করেছেন কালো, হলুদ ও সাদা রং। এই চিত্রটি দেখলে দর্শকদের মনে পবিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তার আত্মপ্রতিকৃতির (১৯০৭) স্কেচেও তেমন রূপ মাধুর্য ফুটে ওঠেনি। পিকাসো যখন একই ক্যানভাসে অনেকগুলো ছবি এঁকেছেন তখন তার উপর পল সেজানের প্রভাব পড়েছে। পিকাসো মূর্ত ও বিমূর্ত সব ধরনের ছবিই এঁকেছেন। বিমূর্ত ধারার ছবি আঁকার সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ব্যবহার করেছেন কিউবিক রীতি।

পিকাসোর একটি ছবির ক্যাপসান হচ্ছে 'Sleeping Women with Shutters'। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে আঁকা চিত্রটি সংরক্ষিত রয়েছে প্যারিসের পিকাসো মিউজিয়ামে। কিউবিক রীতিতে আঁকা চিত্রটির মধ্যে নারীর অবয়ব ভেঙে ভেঙে কিউবিক রীতিতে ব্যবহার করেছেন পিকাসো। এটি একটি বিমূর্ত ধারার চিত্র। কিন্তু এতে রঙের ব্যবহার সাধারণ দর্শকদের মনেও কাব্যিক অনুভূতির সৃষ্টি করে।

জয়নুল আবেদিন কিউবিক রীতিতে অনেকগুলো ছবি এঁকেছেন। কিন্তু ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তিনি মূর্ত প্রতীককেই ব্যবহার করেছেন। কিউবিক রীতিতে আঁকা তার একটি ছবির নাম হচ্ছে 'বাঙালি কুমারী'। রঙিন কালিতে আঁকা চিত্রকর্মটিতে ব্যবহার করেছেন হালকা লাল ও নীল রং। এর ফলে বাঙালি কুমারীর চেহারায় ফুটে উঠেছে সহজ-সরল ভাব। তিনি কিউবিক রীতিতে দুই-একটি বিমূর্ত চিত্রও এঁকেছেন। কাগজের উপর তেল রঙে আঁকা এ ধরনের একটি ছবির নাম হচ্ছে 'প্রসাধন'। চিত্রটিতে একজন নারীর অবয়ব রয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী গাঢ় লাল

রং এবং হলুদ রং দেখে তা অনুধাবন করতে হয়। একই ধারার চিত্র 'কৃষক'-এর প্রতিকৃতি এঁকেছেন জল রঙে। এটি বিমূর্ত ধারার ছবি হলেও প্রতীকগুলো মূর্ত। যেমন, কৃষকের হাত কিংবা হাতে ধরা কাস্তে। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়, তেমন জয়নুলের চিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছে চিত্র। তার চিত্র ছড়িয়ে রয়েছে গ্রাম ও শহরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল। এর সঙ্গে মাঝে মাঝে যুক্ত হয়েছে ইতিহাস চেতনা। কিন্তু নগরের প্রচণ্ড অভিঘাত তার চিত্রকলায় নেই।

প্রকাশবাদী শিল্পীরা আকৃতি ও বর্ণকে অনুভূতি প্রকাশের বাহন হিসাবে মনে করতেন। ফলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই আকৃতি ও রং-কে বিকৃত করেছেন। যেমন ভ্যান গগের 'সাইপ্রেস গাছ' কিংবা 'তারকা-উজ্জ্বল রাত্রি' ছবি দেখলে মনে সৃষ্টি হয় নৃত্যগীতের অনুভূতি। গগ্যাঁর ধারণা, চিত্রের ধর্ম হচ্ছে সঙ্গীত ও বর্ণের সুসংহতি সৃষ্টি করা। তাতে দৃশ্য বর্ণনার দরকার নেই। মাতিস ও কান্ডিনস্কি এই ধারার বাহক। পিকাসো প্রতিটি বস্তুকে একটি দৃষ্টিবিন্দুতে রেখে দেখেছেন। এর ফলে তার চিত্রের বস্তু স্থাপিত হয়েছে একটি তলে। নকশায় ফুটে উঠেছে বিভিন্ন কোণ।

কিউবিস্টরা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করেছেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ থেকে। চিত্রকলা অঙ্কনের বিচিত্র দর্শনকে ব্যাখ্যা করলে একটি আকৃতিগত ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন-বস্তুবাদীরা নির্ভর করতেন যথাযথ বর্ণনার উপর; ইমপ্রেসনিস্টরা গুরুত্ব দিতেন বস্তুর আলো-ছায়ার উপর; প্রকাশবাদীদের আগ্রহ ছিল আবেগময় অভিজ্ঞানের প্রতি। আর কিউবিস্টরা জোর দিতেন বস্তুর জ্যামিতিক আকৃতির উপর। পরাবাস্তবাদীরা নিমগ্ন হতেন চেতনা-অবচেতনার গভীরে। জয়নুল আবেদিনের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বাস্তববাদী ও প্রকাশবাদী দর্শন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিউবিজম। তার প্রকাশবাদী চিন্তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে পরাবাস্তবতা। যেমন-তিনি 'কালবৈশাখী ঝড়' চিত্রটি এঁকেছেন হালকা জলরঙে। চিত্রে ধ্বংসের তাণ্ডব নেই। নৈসর্গিক সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যের মধ্যে যে ধ্বংসের বীজ রোপিত রয়েছে, সেই অনুভূতিকেই তিনি তুলে ধরেছেন 'কালবৈশাখী ঝড়' চিত্রে। জয়নুল তার চিত্রে সব সময়েই শান্ত ভাব এবং সুরের সংহতি বজায় রেখেছেন। তার এই দর্শনের জন্ম হয়েছে লোকসমাজ থেকে। তার চিত্রকর্মে রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণ। মানুষ ও মানবতার দর্শন।

# শিল্পাচার্য ও লোক কারুশিল্প

ড. বিশ্বনাথ সরকার

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ১৯১৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার (তৎকালীন মহকুমা শহর) বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম তমিজ উদ্দিন, মাতার নাম জয়নাবুন নেছা। শিল্পাচার্য জয়নুল ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক, আকাশ-সমুদ্র, মেঘ-বৃষ্টি, ফসলের মাঠ, নদী-খাল-বিল, পাখ-পাখালি, বৃক্ষরাজি, কৃষক, শ্রমিক, জেলে, কামার, কুমার ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ক্ষেত্র। তিনি ছুঁটে যেতেন ফসলের মাঠে, নদীর ধারে, নদীর গভীরতা যেখানে সবচেয়ে বেশি, কৃষকের কাজ দেখতে, জেলের জাল ফেলা, তাঁতীর জাল বোনা, কুমোরের মাটির হাঁড়ি তৈরি বা বেদেনীর সাপের খেলার অতি নিকটে গিয়ে অনুধাবন করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাংলার প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে বড় হয়েছেন বলেই পরবর্তী কালে তাঁর সমগ্র নিপুণ শিল্প ভুবন গড়ে উঠেছে। এদেশের প্রকৃতি আর সাধারণ মানুষের কথা তিনি ভাবতেন। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার মানুষ, সমাজ, পরিবেশ ও নিরক্ষর লোককারুশিল্পীদের জীবন তাঁকে যেন অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, তেমনি তিনিও বার বার তাঁর ছবিতে এসব দৃশ্য তুলে ধরেছেন।

মহান শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিতি গড়ে উঠেছে তাঁর দুর্ভিক্ষের ছবির মধ্য দিয়ে। এই উপমহাদেশের দুর্ভিক্ষের সময় পথে প্রান্তরে একেবারে কাছে থেকে দুর্ভিক্ষের দৃশ্য তুলে ধরেছেন তার রেখা চিত্রের মাধ্যম। কলম ও তুলির টানে অনাড়ম্বর বৈচিত্রহীন, রংহীন নির্মম জীবনের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। এখানেই মহান শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব। এছাড়াও তাঁর ছবিতে আবহমান বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য এবং আমাদের লোক ও কারুশিল্পের ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। স্বদেশের ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্যের শিল্প বৈশিষ্ট্যের স্বার্থক মিলন ঘটেছে তাঁর শিল্পকর্মে।

শিল্পাচার্য জয়নুল ছিলেন ৯ (নয়) ভাই বোনের মধ্যে বড়। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি তার ছিল আগ্রহ ও উৎসাহ। ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে

পড়াশোনার সময়ে দিল্লির স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছোটদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় তিনি সারা ভারতে প্রথম স্থান লাভ করেন। কলকাতায় থেকে আর্ট স্কুলে পড়ার খরচ চালানো বাবার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। তার ওপর আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের মুরব্বিরাও ছবি আঁকাকে ভালো চোখে দেখতেন না। তদুপরি সে যুগে চিত্রশিল্পীদের তেমন কদর ছিল না। শেষ পর্যন্ত মা সাহস যোগালেন, নিজের সোনার হার বিক্রি করে বড় ছেলেকে কলকাতায় আর্ট স্কুলে পড়তে পাঠালেন। অনেক কষ্ট, অভাব, অনটন ও সংগ্রাম। অদম্য উৎসাহ ও নিষ্ঠা নিয়ে আর্ট স্কুলের পাঁচ বছরের কোর্স শেষ করে পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। ভালো শিল্পী হিসেবে ছাত্রজীবনেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ছাত্রজীবন শেষ করার আগেই ১৯৩৮ সালে আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। সে বছরই জাতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে ৬টি জলরঙ চিত্রের জন্য গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করেন শিল্পী জয়নুল। সে সময় এই পদক ছিল শিল্পীদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।

১৯৪২-৪৩ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের অবহেলার কারণে সারা বাংলা জুড়ে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। গ্রামবাংলার লাখ লাখ লোক দল বেঁধে ছুটে গেল খাবারের সন্ধানে, তখনকার রাজধানী কলকাতায়। অলি-গলি, ফুটপাতে রাজপথে অগণিত মানুষ না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কাক ও কুকুরের সঙ্গে বুভুক্ষু মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খুঁজে ফিরছে ডাস্টবিনে, নর্দমায়। দিনরাত ঘুরে ঘুরে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এ দৃশ্য এবং অনেক স্কেচ-অনেক ছবি আঁকলেন, বিষয় দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজন করল তার প্রদর্শনীর। পরে দিল্লিতেও হল প্রদর্শনী। দুর্ভিক্ষ-চিত্রমালার জীবন্ত দৃশ্য ফুটে তোলার জন্যে শিল্পী জয়নুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দেশে ও দেশের বাইরে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর জয়নুল আবেদিন কলকাতা থেকে চলে আসেন ঢাকায়। ড্রইং শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে নর্মাল স্কুলে। তারপর অনেক সংগ্রাম ও পরিশ্রম করে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট ছবি আঁকা শেখার বিদ্যাপীঠ। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিল্পকলা আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলেন এবং বাংলাদেশে শিল্পকলা চর্চার ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করে এদেশের শিল্পীসমাজকে নেতৃত্ব দান করেন। কিছুদিন

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালে জয়নুল আবেদিন পাকিস্তানে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পদক লাভ করেন। কিন্তু বাঙালির স্বাধীকার আদায়ের দাবিতে ও পাকিস্তানি সামরিক কুশাসনের প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সেই হেলালে ইমতিয়াজ উপাধি প্রত্যাখান করেন। ১৯৬৯ সালে প্যালেস্টাইনি যোদ্ধাদের আমন্ত্রণে তাদের সঙ্গে ক্যাম্পে ও যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন। অসংখ্য স্কেচ ও ড্রইং করা সেই সব ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। তার বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে দুর্ভিক্ষ চিত্রমালা, সংগ্রাম (কাদায় পড়া গরু গাড়ি), ঝড়, মই টানা, গুণটানা, গাঁয়ের বধূ, বেদেনী, পাইন্যার মা, সাঁওতাল রমণী, মা, নদী ও নৌকা নিয়ে অনেক জলরঙ ছবি, আদিবাসীদের জীবন ও প্রকৃতির ছবি, নবান্ন, পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ আবহমান বাংলার এক বিশাল ছবি, ৭০-এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের ছবি-মনপুরা-৭০, ৩০ ফুট দীর্ঘ এক মর্মস্পর্শী স্কেচচিত্র ইত্যাদি এবং আরো অনেক ছবি।

শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান ছিল। তার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন চর্চার জন্য এর বিস্তার ঘটেছে। জয়নুল আবেদিন অনেক জাতীয় দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শহীদ মিনার, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠাসহ বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব তারই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন (লোকশিল্প জাদুঘর) প্রতিষ্ঠা তারই স্বপ্ন ও উদ্যোগের ফসল। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রায় দেশেই তিনি ভ্রমণ করেন। নিজের চিত্রকলা ও বাংলাদেশের শিল্পকলার বহু প্রদর্শনী করেছেন বিভিন্ন দেশে; বহু বার স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিদেশে। ১৯৭৪ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান লাভ করেন। বাংলাদেশের মানুষ তাকে ভালোবেসে উপাধি দিয়েছে 'শিল্পাচার্য'।

গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে অনেক প্রতিকুলতায় বিচিত্রতর ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিজস্ব সত্ত্বা ও স্বকীয়তায় টিকে আছে, অবহেলিত গ্রাম বাংলার নিরক্ষর লোক ও কারুশিল্পীদের হস্তশিল্প জনজীবনের নিত্যব্যবহার্য, লোক কারুশিল্প পণ্য সামগ্রীতে ঐতিহ্যবাহী লোক শিল্পের আসল রূপ ফুটে উঠেছে। এই শিল্পই গ্রাম-বাংলার আনাচে কানাচে, অযত্নে-অবহেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই ঐতিহ্যবাহী লোক কারুশিল্প সম্ভার বিলোপ

হতে চলছে, অথচ এই শিল্প সম্ভারই আমাদের দেশের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই শিল্পকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৫৬-৫৭ সালে তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জাপান সফরে গিয়ে একটি সিরামিক শিল্পনগরী পরিদর্শন করেন। শিল্প নগরীটি ছিলো মহাসড়ক থেকে কিছুটা অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সকল দর্শনার্থীদেরকে কর্মরত শিল্পীদের পোশাক পরিয়ে দেয়া হচ্ছে দেখে, শিল্পাচার্যের কৌতূহল বেড়ে গেল। সিরামিক শিল্প নগরীর ভিতরে প্রবেশ করতেই শিল্পাচার্যকে ও কর্মরত শিল্পীদের পোশাক পরিয়ে দেয়া হলো। উৎফুল্ল চিত্তে শিল্পাচার্য চারিদিকে তাকাচ্ছেন, শিল্পী ও দর্শনার্থী সকলের একই পোশাক, শুধু পার্থক্য দর্শনার্থীগণ প্রদর্শন করছেন আর শিল্পীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। আনন্দময় শৈল্পিক পরিবেশে শিল্পাচার্য সমগ্র এলাকা ঘুরে দেখেন এবং কর্মরত শিল্পীদের সাথে একান্ত আপন মনে মত বিনিময় করেন। অতঃপর সফরের অভূতপূর্ব সাফল্য ও ধারণা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বদেশে ফিরেই সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিল্পাচার্য লোক ও কারুশিল্পকে বিকশিত করার প্রয়াসে অধিক আগ্রহে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তিনি গ্রাম-বাংলার সাধারণ লোক কারুশিল্পীদের অতি নিকটে গিয়ে এই উপলব্ধি এবং অনুধাবন করেন। এই শিল্পকে রক্ষা না করলে অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে-এই ভাবনায় তিনি নিজে থেকেই ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে লোক শিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এই জাদুঘরে ঐতিহ্যবাহী লোক কারুশিল্পের ব্যাপক প্রচার ও গবেষণা হবে এবং জাদুঘরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে কারুশিল্প গ্রাম (শিল্পীদের বসতি)। এই লোকশিল্প জাদুঘর প্রসংগে শিল্পাচার্য বলেন, "আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের গৌরবময় পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি। দেশী জিনিসের কদর আমরা ভুলে যেতে বসেছি। সত্য সুন্দর মনের অভাবে বাংলাদেশে চলেছে রুচির দুর্ভিক্ষ, শতকরা কুড়ি ভাগ লোকের মতামত এবং উপলব্ধিকে ভয়ে অথবা ভয় পাওয়ার আনন্দে গ্রহণ করছে শতকরা আশি ভাগ লোক। বহুদেশ ঘুরেও আমি বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য ও এদেশের মত অতুলনীয় প্রকৃতিকে সৌন্দর্য কোথাও দেখতে পাইনি অথচ এই সুন্দরের উপলব্ধি আজ অনেকের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা শিল্পীর জাতি। বিদেশীরা লুটে নিয়ে গেছে আমাদের অতীতের স্মৃতি বার বার। আজও নিয়ে

যাচ্ছে। নবাবগঞ্জের কাঁথার যে প্রতীকধর্মী নকশা ও মাছ-পাখি-হাতি-ফুল-লতা পাতার সমাবেশ রয়েছে ফ্রান্সের মিউজিয়ামে তা নিয়ে গবেষণা হয়। দেশের লোক হয়ে আমরা যা চিনি না বা জানি না বিদেশে গিয়ে এদেশ থেকে প্রাপ্ত সেসব সামগ্রীর সযত্ন সংগ্রহ দেখেছি বিভিন্ন জাদুঘরে। অনেক দেরী হয়ে গেছে এমনিতেই আজ এখনি পদক্ষেপ নিতে হবে সবাইকে। সরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে বাঁচাতে হবে আমাদের লোকশিল্পের নিপুণ কারিগরদের। স্থাপন করতে হবে লোক জাদুঘর।"

স্বাধীনতা লাভের পর শিল্পাচার্য বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পকে রক্ষাকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান। শিল্পাচার্যের দিন-রাতের কঠোর পরিশ্রমে অবশেষে ১৯৭৫ সালে সরকার এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বিস্তৃত ১৭০ বিঘা আয়তনের ক্যাম্পাসের মধ্যে লোককারুশিল্প জাদুঘর, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, কারুশিল্পগ্রাম, লোক কারুশিল্প গ্রন্থাগার, বিক্রয় কেন্দ্র, জামদানি পল্লী (কারুপল্লী), সুদীর্ঘ আঁকা-বাঁকা হ্রদ, পুকুর, বিভিন্ন প্রকার দেশীয় ফল ও ফুলের উদ্যান। ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রতিদিন ফাউন্ডেশনে পর্যটক/দর্শনার্থীদের আগমন বেড়েছে। শিল্পাচার্য আজ আমাদের মাঝে নেই; কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নতুন জাদুঘরটির নামকরণ করা হয়েছে শিল্পাচার্যের নামেই। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৭৬ সালে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ চত্বরে রয়েছে তার সমাধি। জয়নুল আবেদিনের আটশ' ছবির সংগ্রহ রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে এবং তার জন্মস্থান ময়মনসিংহে রয়েছে ঊনাশিটি চিত্রকলা-'জয়নুল আবেদিন চিত্রসংগ্রহশালা'য়।

## গ্রন্থপঞ্জি


১। জয়নুল আবেদিন, নিউভ্যালুজ, ভলিউম ৪, ২, ৩, ১৯৫২।

২। চিত্রশিল্প ঃ বাংলাদেশের, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ইং।

৩। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জন্মবার্ষিকী ১৯৮১ইং বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

৪। জয়নুল আবেদিন, আব্দুল মতিন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৮ ঢাকা।

৫। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, এ, সাত্তার, ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৮, ঢাকা।

৬। শিল্পাচার্য ও বাংলার লোকশিল্প, বিশ্বনাথ সরকার, দৈনিক খবর পত্রিকায় ২৬/৫/৮৯ইং তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধ।


*বিঃদ্রঃ- ২০০৬ সালের ৩০শে মে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত সোনারগাঁও আলোচনা অনুষ্ঠানে নিবন্ধটি উপস্থাপিত হয়েছে।*

# জয়নুল আবেদিন ঃ কর্ম ও ব্যক্তিত্ব

মো ঃ রবিউল ইসলাম

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন নানা কারণে আমাদের শিল্প ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্মরণীয়, বরণীয় বক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আবহমান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত একজন সচেতন মানুষ। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের বিশাল ভাণ্ডার তাকে আবেগ তাড়িত করে। স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে সকল শিল্পীকে বাংলাদেশে আমরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় পেয়েছি তাঁদের মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছিলেন অন্যতম। জয়নুলকে ঘিরেই বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গন আজ বিশ্বদরবারে পরিচিতি লাভ করেছে।

কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষা নিলেও পাকিস্তান সৃষ্টির পর মাতৃভূমির টানে স্বাভাবিক কারণেই আবেদিন চলে এসেছিলেন বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) দেশে ফিরে শিল্পচর্চা তথা শিল্প অধ্যায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তোলার তাগিদ অনুভব করেন, সে প্রেক্ষিতেই গড়ে তোলেন শিল্প অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠান ঢাকা চারুকলা ইনিস্টিটিউট। নতুন দেশে নতুন উদ্দীপনায় বাংলাদেশে শিল্পের আত্মপরিচয় খুঁজতে তিনি সচেষ্ট হন। ভারত বর্ষের স্বদেশী আন্দোলন এবং ভারতীয় শিল্পকলার নবজাগরণ, নিজ দেশের শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলেছিল। নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে বাংলার মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে শিল্প রচনায় মনোযোগী হন। তাইতো মজুর, জেলে, নৌকা, মাঝি, সাঁওতাল রমণী, বেদেনী, গ্রামের বধূ, সমাজে অবহেলিত চাষী-এরাই তাঁর চিত্রের প্রধান চরিত্র।

জয়নুলের শিল্পকর্মকে অনুধাবন করতে হলে শিল্পী জয়নুলের পাশাপাশি ব্যক্তি জয়নুলকে জানা প্রয়োজন। জয়নুল ছিলেন সহজ, সাদাসিদে, অত্যন্ত প্রাণখোলা; কিন্তু তীক্ষ্ম অনুভব অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষ। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিখাঁদ আন্তরিকতা, হৃদয়ের প্রসারিত সৌন্দর্য, স্পষ্টবাদিতা এবং সরলতা যে কোন সচেতন মানুষকে আকৃষ্ট করতো। তাঁর শিল্পকর্মেও সে প্রতিচ্ছায়া প্রতীয়মান। তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্যে স্বতঃস্ফূর্ত তাই প্রধান, ছবির রূপ ও রসের

অনুভূতি তিনি অতি সহজেই সবার অন্তরে পৌঁছে দিতে পারতেন। একটি জাতি, তার আত্মগরিমা, অনুপ্রেরণা, তার দেশের ঐতিহ্য, লোককলা, লোকশিল্প ও জীবনকথা জয়নুল অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। ঢাকার অদূরে সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, আজীবন লোক উৎস ও লোকশিল্প সংগ্রহ, লোকজীবন সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ তা প্রমাণ করে। প্রকৃতি, সমাজ আর পরিবেশকে তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। মানবতাবোধ ও সমাজ সচেতনতার বহি:প্রকাশ তাঁর ছবিগুলিতে অত্যন্ত গভীরভাবে চোখে পড়ে। বাংলার লোকশিল্পের সহজ সরলীকরণ এবং বর্ণনামূলক আবেদন তাঁর ছবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চাশের দশকে তিনি ইউরোপের বেশ কিছু দেশ সফর করেন। ইউরোপ সফর শেষে নিজের শিল্প ও ঐতিহ্যের প্রতি আবেদিনের সচেতনতা আরও বেড়ে যায়। এই সচেতনতা তাঁকে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা জোগায়। লোকশিল্পের বিপুল জনগোষ্ঠীর ভেতরে 'শিল্প চেতনা' জাগিয়ে তোলা তিনি অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করলেন। দেশে রুচির দুর্ভিক্ষে নিজের অস্তিত্বকে তুলে ধরা এবং দেশীয় রূপকলার সাথে সাক্ষাৎ পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তাও জয়নুল বার বার উপলব্ধি করলেন। তাই বাংলার পিঠার নকশা, কাঁথার নকশা, ঋতুর রঙের বৈচিত্র্য, লোক জীবনের বিভিন্ন দিক তাঁর ভাবনার জগতে সর্বক্ষণই বিচরণ করতে দেখা যায়। সেই সময়ে আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে 'কলসি কাঁখে রমণী', 'জলকে চল', 'রমণী যুগল', 'কেশ বিন্যাসে রমণী', ইত্যাদি ছবি উল্লেখযোগ্য। ছবিগুলোতে বাংলার লোকজীবন ও লোক শিল্পের ভাব-আবেদন অত্যন্ত পরিষ্কার।

বাংলাদেশের চিত্রকলার অঙ্গনে যখন ইউরোপীয় প্রভাব অত্যন্ত জোরদার হয়ে উঠছিল, পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নানাভাবে যখন দেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছিল তখন পাশ্চাত্যের এই প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় জয়নুল আবেদিন সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর ছাত্র অনুসারীদের নানাভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। বিদেশী আঙ্গিক গ্রহণে যেমন তাঁর কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না, তেমনি পাশ্চাত্য অন্ধ অনুকরণেও তিনি শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন না। একজন শিল্পী প্রকৃতি তার সংস্কৃতি ও পরিবেশের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ঘটানোই ছিল তাঁর শিল্পতত্ত্ব।

জাতীয় ঐতিহ্যের শুদ্ধতা রক্ষার ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিন ছিলেন অগ্রজ। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশি-বিদেশী নানা পরম্পরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন মননশীলতা। তাই দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রাচ্য আঙ্গিকের রেখা, রঙের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও সমতলভাবে ব্যবহার, ড্রইংয়ের পরিমিত টান, নকশার বাস্তবিক সরলীকরণ ও প্রকৃতির আপন অনুভূতি-এই ছিল

আবেদিনের চিত্রজগৎ। নিজের জাতীয় ঐতিহ্য লোককলার গুণাবলীর ভেতর দিয়ে তিনি সেই নতুন শৈলীর সন্ধান পেয়েছেন। প্রকৃতিকে সামনে রেখেই তিনি তাঁর ক্যানভাসে রং ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে দেশ বিভাগপূর্ব কলকাতার চিত্র-আন্দোলন তাঁকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। লোকরীতি চিত্রাঙ্কনে অবনীন্দ্র শিল্পাদর্শ তাকে উৎসাহিত করেছে। প্রকৃতি, সাধারণ জীবন, রাখালিয়া আর গ্রামীণ বিষয়ের উপর তার উপর তাঁর আগ্রহ অনুসন্ধানে তা জানা যায়।

জয়নুল আরও কিছু ছবি আঁকেন বাংলার কষ্টসহিষ্ণু মানুষের জীবনের গতিময়তা নিয়ে। সে সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ছবি "সংগ্রাম"। ছবিটিতে সংগ্রামী চেতনা, একাকিত্ব ও যন্ত্রণার আর্তনাদ অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই সময়টিতে বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে তখন পূর্বপাকিস্তানের সবধরনের মানুষই প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। সে সময় ৫২-এর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তার স্বপক্ষে ব্যানার, পোস্টার, এমনকি প্রতিবাদ মিছিলেও জয়নুল আবেদিনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

ষাটের দশকে জয়নুল অল্প কিছু ছবি অংকন করেন। এসব ছবিতেও তিনি একই প্রতিবেদন নিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু ৭১-এর স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্ত হতে বাংলাদেশের শিল্প অঙ্গনের পরিস্থিতি এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। শিল্প, সাহিত্য, সর্বত্রই নতুন শক্তি নিয়ে নবসৃষ্টির বাস্তবায়ন ঘটে। স্বাধীনতার এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে জয়নুল নতুন উদ্দীপনায় তাঁর 'নবান্ন' ছবিটি আঁকেন। বাংলার সমাজ ব্যবস্থার ফসল কাটার আনন্দের পাশাপাশি শোষণ-বাঙালির সুখ দুঃখের চিরকালের এই সমস্যাটি তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত ব্যাঞ্জনায়। লোকশিল্পের গুটানো চিত্রের বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য ছবিটিতে বিদ্যমান। এ সময়ে "মনপুরা" শিরোনামের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সিরিজ তিনি এঁকেছেন। বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসে অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশুর মর্মান্তিক মৃত্যু সংবলিত এই ছবি। জীবনের ভাঙাগড়ার মধ্যে নতুন জীবনের হাজার দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়েও উপস্থাপনা দেখা যায় তাঁর ছবিতে। উল্লিখিত ছবিগুলো শিল্পাচার্যের মহৎ শিল্পকর্ম।

মহৎ শিল্পকর্ম সেটিই যা সমস্ত গোষ্ঠী, শ্রেণী, কাল, ধারা ও রীতি অতিক্রম করে মানুষকে পরিতৃপ্ত করে। যামিনী রায়ের ভাষায় to cheer the eye and comfort the soul. এই পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বেশ কিছু শিল্পকর্ম কালোত্তীর্ণ নিশ্চয়ই।

বাংলাদেশের এ কৃতি শিল্পী সম্পর্কে 'জয়নুল আবেদিন' শীর্ষক গ্রন্থে আবদুল মতিন লিখেছেন, 'জয়নুলের শিল্পদর্শন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। জয়নুলের শিল্পবোধ সৌন্দর্যমুখী। তাঁর এই সৌন্দর্যপ্রিয়তার সাথে একটা কল্যাণধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে। শ্রমজীবি মানুষের শ্রম প্রয়োগের সাথে এই শিল্পবোধের এক সূক্ষ্ম

সাযুজ্য রয়েছে। এক পর্যায়ে আমরা জয়নুলকে বলতে পারি জন্মরোমান্টিক। কিছুটা রোমান্টিক বিপ্লবের ধাচও হয়তো তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য যে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বাস্তবতার দুর্গম-দুরত্যয় পথ থেকে বিচ্যুত হননি। শাস্ত্র বলে যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধার শানিত দুরত্যয় "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি–" কাব্যোপনিষদ।

এই অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙ্গেই তিনি বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন সুদীর্ঘ ২৯ বছর। শিল্পাশ্রয়ী আবেগ তাড়িত হয়েই জয়নুল হৃদয়ানুভূতির সিঁড়ি ভেঙ্গে বাংলার নৈসর্গ, গণমানুষ এবং তাদের বিচিত্র কর্মতৎপরতার অতি নিকটে অনায়াসে হাজির হতে পেরেছিলেন। তিনি বাংলার মানুষের হাসি-গান সুখ-দুঃখকে আশ্রয় করে গড়ে তুললেন শিল্পরীতির এক অভিনব ইমারত। এই ইমারত শুধুই জয়নুল আবদিনের; এই ইমারত বাংলাদেশের–A Lone Bangladeshy Institution for Arts and Crafts.

কোলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র জীবন থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তিনি বিশ্বের বহু দেশ, বহু শিল্প-গ্যালারি, জাদুঘর ও প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন। বহু খ্যাতনামা শিল্পী, শিল্প-সমালোচক ও শিল্পবোদ্ধার সংস্পর্শে এসেছেন, বহু শিল্পআন্দোলন, ফর্ম ধারা রীতির সাথে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে তেমন ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কোন বিশেষ School of thought in painting কি জয়নুলকে প্রভাবিত করতে পেরেছে? কিম্বা কোন খ্যাতনামা শিল্পী? এর জবাবে পর্যবেক্ষক শিল্পবোদ্ধারা এই অভিমতই ব্যক্ত করেন যে, জয়নুলের শিল্পচর্চায় কোন প্রভাবই তেমন ক্রিয়া করতে পারেনি। শিল্পচার্যের পদস্খলন ঘটেনি, মহাকালের সাক্ষ্য শিল্পাচার্যের বটমূল কোন দুর্বলতার স্রোতই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিতে পারেনি। কোন ব্যক্তিগত রূপক বা কল্পনা, কোন ফ্যান্টাসি বা রূপকথার সাগরে তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক ও পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করেননি। নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানির যে বৈচিত্র্য, পানিতে প্রকৃতি বিস্ময়কর রংচর্চার আয়োজন করে তাঁর প্রতিটি মুহূতকে তিনি ক্যানভাসে বন্দী করেন নিপূণ মুন্সিয়ানার সাথে। খুঁটি ভেঙ্গে মৌলভী বাড়ির দুরন্ত ষাঁড়টা ছুটলে যে 'সিভালরির' সৃষ্টি হয়, শক্তিমান গ্রাম্যতরুণ পণ্যবোঝাই ভারী নৌকাটাকে গুণটেনে উজানে টেনে নিলে তাদের পিঠের ঘামের মধ্যে সদা সঞ্চালনমান পেশীগুলির যে বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠে, অবসরে যৌবনবতী সাঁওতাল কন্যার কেশবিন্যাস যে সর্বনাশা বিনোদনের ইঙ্গিত দেয়, সত্তরে মনপুরার চরে অবিস্মরণীয় মৃত্যুর যে বীভৎস মিছিল জমে উঠে, দুর্ভিক্ষের কাক যে কি মর্মস্পর্শী পাখি তা জয়নুলের তুলিতে যতবেশি

জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে বিশ্বের আর কোন চিত্র শিল্পীর তুলিতে এত typical সম্ভাবনাময় হতে পারেনি। এটিই জয়নুলের প্রতিভার বিস্ময়কর দিক। জয়নুলের কাক কালোত্তীর্ণ, এমন কাক আর কেউ আঁকতে পারেনি। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনার কামরুল হাসান (জন্ম ঃ ১৯২১) বলেন ঃ

"Take for example Adedin's crow. In its simple image is concentrated all the grief and sufferings of terrible famine. This is something which was never achieved before by anyone."[৯]

জয়নুল আবেদিনের শিল্প-দর্শন অপরাজিত মানুষের মৌল সততা, কল্যানবোধ, শান্তি, অনন্দময়তা ও জীবিকা প্রয়াসের সাফল্যে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের সাথে জয়নুল অতি সাবধানে যুক্ত করেছেন বাংলার প্রকৃতি, জীবন, জনগণ, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও পারিপার্শ্বিককে। এই আত্মদর্শনের জন্য তিনি যে জ্ঞান আহরণ করেছেন; যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার ঠিকানা লোকজ, দেশজ, গ্রামজ; অভিজ্ঞতার সুবিস্তৃত রৌদ্র ঝলমল ও বৃষ্টিস্নাত এক সোঁদা অঙ্গন। এ কাজে সহায় ছিল তাঁর বেগবান উপলব্ধি। মরুভূমির তৃষ্ণার্থ বালুকারাশি বিদ্যুত বেগে যে রকম পানি শুষে নেয় জয়নুলও তেমনি চোখের পলকে গ্রহণ করেছেন বাংলার নির্যাস।

শৈশবের চিত্রাঙ্কন বাদ দিয়ে তাঁর বিকাশ কাল থেকে উত্তীর্ণ কালের একটা মোটামুটি হিসাব যদি আমরা ধরি তাহলে এই দাঁড়ায় যে, জয়নুল ১৯৩২ থেকে ১৯৭৫-এর শেষার্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৩ বছর সক্রিয়ভাবে ছবি এঁকেছেন।'

বাংলাদেশের কৃতী পুরুষ জয়নুল আবেদিন ১৯৭৬ সালে ২৮শে মে ইন্তেকাল করেন। আমরা তাঁকে চিহ্নিত করতে পারি বিপ্লবী সমাজ সচেতন শিল্পী হিসাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প নিছক শিল্পের জন্য নয়, শিল্প সর্বাংশে জীবনের জন্য। বাংলার শিল্প সংস্কৃতির এই বরপুত্রকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

# জয়নুলের শিল্প আঙ্গিক

এ. কে. এম আজাদ সরকার

আমরা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মধ্যে পাই বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য, চেতনা, প্রকৃতি, পরিমণ্ডল, প্রাণের আকুতি ও ভাষার স্ব-প্রকাশ প্রতিবিম্ব। বাংলার মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশ, স্বদেশী সংস্কৃতি, মজুর, জেলে, নৌকা, মাঝি, সাঁওতাল-রমণী, বেদেনী, গ্রামের বধূ, সমাজের অবহেলিত চাষী-মূলতঃ এরাই তাঁর শিল্প চরিত্রের প্রধান উপজিব্য চিত্ররূপ। বলিষ্ঠ রেখার স্বতঃস্ফূর্ত টান তাঁর ছবির প্রতিটি অনুভূতিকে করেছে জীবন্ত।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রসঙ্গে অকপটে যে কথাটি প্রথমেই নিঃসঙ্কোচে বলে দেয়া যায় তা হলো, তিনি নিজেই ছিলেন একটি ইনস্টিটিউট। তাঁর হাত ধরে সূচনা হয়নি শুধুই ঢাকা আর্ট কলেজ, ময়মনসিংহ জয়নুল শিল্প সংগ্রহশালা বা বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। শুরু হয়েছে এ-দেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারু ও ব্যবহারিক কারুকলার। তিনি শিল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতি ধারায় পৃথকভাবে অথবা একক সম্মিলনের মধ্য দিয়ে যুক্তিপূর্ণ যে শিল্পরীতির ছাপ রেখেছেন তা একটি স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব শিল্প দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। আর একই সঙ্গে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত চারুশিল্প ও তাঁকে আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছে। এভাবেই স্বদেশী ঐতিহ্য এবং প্রাচ্য-প্রাতিচ্য, এশীয় এবং ইউরোপীয় শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সু-সমন্বয় ঘটেছে তাঁর প্রতিটি কাজে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সমগ্র শিল্পভূবনে বিশেষভাবে বিস্তার করে আছে তাঁর সমৃদ্ধ সেই শিল্প-বৈশিষ্ট্যের কালো রেখাঙ্কনে সৃষ্ট "তেতাল্লিশের স্কেচ-মালা"। ছবিগুলোর প্রেক্ষিত এবং সামগ্রিক অর্থেই বলা হয় তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ ড্রইংবিদ। অনেকের মতে তেল রঙের কাজে জয়নুলের অগ্রসরতা প্রশ্নাতীত। ঠিক একইভাবে তাঁর জল রঙের কাজগুলোকে মনে হয় জলচিত্রের ক্ষেত্রে দক্ষতা-বৈদগ্ধ্য প্রমাণের একটি প্রামাণ্য দলিল।

আসলে একজন সৃজন শিল্পীকে বিশেষ করে জননন্দিত শিল্প-স্রষ্টাদের কিন্তু কখনো কোন অবস্থাতেই খণ্ডিতভাবে দেখা উচিত নয়। যিনি মহান, তাঁর

মাহাত্মের দিকটিই বড় কথা। কোন দিকে দুর্বলতা, কোন দিকে অসামান্য সে হচ্ছে নেহায়েতই গৌণ ব্যাপার। উল্টোভাবে বললে এমনও বলা যায় যে, তাঁর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁকে আরও অধিক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। একদিকে তাঁর শিল্পগুণ সম্পন্ন রেখাঙ্কন আশ্রিত অতুলনীয় শক্তিশালী চিত্রাবলি। তারই সঙ্গে সমন্বিত কখনো অ্যাক্রিলিক, টেম্পারা অথবা গোয়াশ প্রভৃতি অস্বচ্ছ জল আশ্রিত মাধ্যমের প্রয়োগ-বিন্যাসের সফল সৃষ্টি। আবার অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ চিত্র-আঙ্গিকে রচিত তাঁর কাজের গভীরতা জোড়ালো এবং গভীর মেজাজী অথচ শিল্পরূপের স্বচ্ছন্দ জটিলতাবিহীন যা খুবই মনোমুগ্ধকর। তৈলচিত্র, কাঠখোদাই, ড্রাইপয়েন্ট প্রভৃতি আলোচিত ও পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত কাজ সবমিলে শিল্পাচার্যের সমগ্র কর্মকাণ্ডে যথাযথ ও সু-নিপুণ এক মাস্টারের মাস্টার পিস বা আর্ট বলা যায়।

মূলত জয়নুলের দৃষ্টিকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করে, আন্দোলিত করে তাঁর-মানসকে, তা হচ্ছে ময়মনসিংহের মধ্যদিয়ে বয়ে চলা বাড়ির পাশের ব্রহ্মপুত্র নদী, নদীর দুই-তীরবর্তী গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন যাত্রা, বাংলার অবারিত প্রকৃতি, আমাদের এই নিসর্গ-দৃশ্য আর নদী-নীল আকাশ পরিবেষ্টিত চিরন্তন তথা বিচিত্র বর্ণিল সব দৃশ্যাবলি। তিনি রীতিমতো এসবের নেশায় পড়ে যান। দ্বিতীয়ত আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত লোক-সাংস্কৃতিক সমাজ-পরিবেশ।

বলিষ্ঠ ড্রইং, জলকালি, জলবাহিত মাধ্যমে মাপজোখের নিরিখে জয়নুল বড় মাপের চারুশিল্পী ও নন্দিত শিল্পস্রষ্টা ছিলেন তা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। জয়নুলের কারিগরি নৈপুণ্য ও দক্ষতার ভিত্তিমূলে ছিল তাঁর সৃষ্টিশীল সুরুচিসম্পন্ন উদ্ভাবন-শক্তি। অবনীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ও নন্দলাল-চর্চিত নব্য-বঙ্গীয় তথা ভারতীয় চিত্রাবলি, ইউরোপীয় পাশ্চাত্য শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি, চিন-জাপানিজ, মুঘল-পারসিক প্রভৃতি চিত্র-ঐতিহ্যের সমন্বিত শিল্প আঙ্গিকের স্বভাব কমবেশি রেখাপাত করেছিলো তাঁর সত্তায় এর চেয়ে বেশি ছিল স্বদেশ-প্রকৃতির রুপ-রঙ এবং বাংলার লোকশিল্পের সহজ ও সরল ভাব-প্রকাশ ভঙ্গির। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে গ্রামীণ সমাজ-পরিবেশ।

জয়নুলের চিত্রকর্মে অনুস্মৃত মাধ্যমসমূহের পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব অনেকটা ছিল 'ক্রস কানেক্শনের' মতো। যেমন- স্বচ্ছ জলরঙের প্রয়োগে অস্বচ্ছরীতি। তেল রঙ প্রয়োগ-আঙ্গিকেও আংশিক ছেড়ে-ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ঘন আলো-ছায়া সৃষ্টি, যা-জলরঙ পদ্ধতি আরোপিত হয়েছে তেল রঙে। মাধ্যম-প্রকরণে এ রকম স্বাচ্ছন্দ্যের উদাহরণ জয়নুলের ক্ষেত্রে অনেক দেয়া যাবে। সবটাই তার স্বকীয়তা বা শিল্প দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য। আর এভাবেই তিনি এগিয়েছেন।

**তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিল্পকর্ম**

১। সাঁওতাল দম্পতি (১৯৫১)
২। সংগ্রাম (১৯৫১)
৩। রমণীর কেস বিন্যাস
৪। অবসরে তিন বধূ
৫। গুণটানা (১৯৬৪)
৬। কলসি কাঁধে বধূ (১৯৫১)
৭। দু'জন সাঁওতাল রমণী (১৯৫৯)
৮। মাছ ধরা (১৯৫০)
৯। মা ও ছেলে (১৯৬১)
১০। নিসর্গ দৃশ্য (বিভিন্ন সময়ে)
১১। পাইন্যার মা (১৯৫৩)
১২। মই দেয়া (১৯৫৯)
১৩। মুক্তিযোদ্ধা (১৯৭১)
১৪। নবান্ন ঃ স্ক্রল (১৯৭০)
১৫। জলোচ্ছ্বাস / মনপুরা ঃ স্ক্রল (১৯৭১)
১৬। স্কেচ (১৯৫৬)
১৭। বাড়ির পথে 'সাঁওতাল দম্পতি'
১৮। চিন্তা (১৯৫৩)
১৯। তোরণ-জাপান (১৯৫৬)
২০। বারান্দা (এল্ গ্রেকোর বাড়ি)
২১। খেয়াঘাটে অপেক্ষা (১৯৫১)
২২। তেতাল্লিশের স্কেচ (১৯৪৩)
২৩। কলসী কাঁখে (১৯৫১)
২৪। কৃষক (১৯৫৩)
২৫। রমণী ও কলস (ষাটের দশকে)
২৬। স্নান শেষে (১৯৫১)
২৭। স্টিমার ঘাট (১৯৫৬)
২৮। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে (১৯৫৭)
২৯। সাঁপুড়ের মেয়ে (১৯৫৩)
৩০। মাছ ধরার পর (১৯৫০)

ছাত্রজীবন থেকে আঁকা বিচিত্র এ-সব মাধ্যমের সাবলীল ও পরিপূর্ণতার ছাপ রেখে গিয়েছেন জীবনের সর্বশেষ ছবিটির মাধ্যমেও। জয়নুলের অসংখ্য স্কেচ, ড্রইং-এ প্রতীকময়তা আছে; শাশ্বত জীবনের ইঙ্গিত আছে। তাঁকে কোথাও খুব

উচ্ছল অথবা আবেগাক্রান্ত হতে দেখা যায় না। তিনি ফিগারকে নির্ভর করে তাঁর ভাবনাকে সাজিয়েছেন। কিন্তু ফিগারগুলো কখনো কেড়ে নেয়নি তার সকল মনোযোগ। তিনি সর্বদাই জমিন বা ক্যানভাসের সকল অঞ্চলে তার অর্থবহ রং ও রেখার বিন্যাস ঘটিয়েছেন পরিমিত মাত্রায়।

রঙ-তুলি দিয়ে প্রকৃতি বন্দনা কিংবা সুন্দরী রমণীদের অবয়ব নিয়ে চিত্রবিন্যাস করেও চিত্রদর্শকদের তৃপ্ত করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন অনায়াসে। কিন্তু শিল্পাচার্য জয়নুল শুধু নান্দনিক কলাকৌশল দিয়ে চিত্রমালা সৃষ্টিতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি। চিত্রকে, ক্যানভাসকে, রঙ-তুলিকে তিনি প্রতিবাদী বক্তব্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের বিষয় দিয়ে তিনি এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার প্রতিবাদী ধারা অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে পঞ্চাশের দশকের একটি উল্লেখযোগ্য ছবি "সংগ্রাম"। শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক হয়ে এসেছে ছবির গরুর গাড়ির চালক। রেখার বলিষ্ঠ টানে সমস্ত ছবিটিতে সংগ্রামী চেতনা, একাকিত্ব ও যন্ত্রণার আর্তনাদ অত্যন্ত প্রকট। তেমনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে ব্যানার, পোস্টার এমনকি প্রতিবাদ মিছিলেও আবেদিনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল কখনো ব্যক্তিগতভাবে কখনোবা কলম-তুলির মাধ্যমে। স্বাধীনতার এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে জয়নুল নতুন উদ্দীপনায় তার "নবান্ন" ছবিটি আঁকেন। বাংলার সমাজ-ব্যবস্থার ফসল কাটার আনন্দের পাশাপাশি সুখ-দুঃখের চিরকালের সমস্যাটি তুলে ধরেছেন তিনি এই চিত্রে। কালো কালি ও রেখায় খণ্ড খণ্ড ঘটনার বর্ণনায় ছবিটিতে ধারাবাহিক কাহিনী রচনা হয়েছে। এই সময়ে "মনপুরা" নামেও আর একটি উল্লেখযোগ্য সিরিজ চিত্র তিনি এঁকেছেন কালো কালি এবং রেখা সংবলিত একই ঢঙে। এতে জীবনের ভাঙা গড়ার মধ্যে ও নতুন জীবনের প্রতীকী হিসেবে দেখা যায় হাজার দুঃখ বেদনার ভেতর দিয়েও সুঠাম এক তরুণ যুবকের উপস্থিতি। আবেদিনের শিল্পরস তাই জনরোষ, জনক্ষোভ। তাঁর ছবি কথাবলে-সমাজের উত্থান, পতন ও গতির। তিনি জাগিয়েছেন এদেশের চিত্রজগতে এক নতুন ধ্বনি "প্রতিবাদ"। আর অন্যদিকে লোক জীবন তাঁর চিত্রজগতের প্রধান সুর।

১৯৫১-এ তাঁর 'বিদ্রোহী' শিরোনামে আঁকা জয়নুল আবেদিনের জলরঙে ওয়াশ ও ড্রইং এর মুনশিয়ানা-দক্ষতার সবগুলো দিকের জোরালো সমন্বয় ঘটেছে। বিশুদ্ধ জলরঙের কাজ; এ ছবির পুরো চিত্রপট উজ্জ্বল হাল্কা ছায়ে রঞ্জিত; কোন বর্ণের আধিক্য নেই, যা তাঁর অন্যান্য অধিকাংশ চিত্রকর্মের স্বভাব লক্ষণীয়। প্রতীকী চরিত্রের এই 'বিদ্রোহী' জলরঙ চিত্রটি জয়নুল আবেদিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ।

'খেয়াঘাটে অপেক্ষা' ১৯৫১ সালে অঙ্কিত উল্লেখযোগ্য এই চিত্রকর্মটি সম্পূর্ণরূপে জলরঙ-এ আঁকা। ছবির শিরোনামের অংশ কোন প্রকার খেয়া বা নৌকার বিষয়টি এখানে অনুপস্থিত। অনেকটা সিম্বলিক সারল্যের প্রতীকী হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে অপেক্ষার বিষয়টি। পঞ্চাশের দশক জয়নুলের জন্য তাঁর শিল্পকর্মের ভূবনে খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত সময়কাল-কিউবিক/ জ্যামিতিক ধাঁচ এবং খানিকটা নিরীক্ষা ধর্মিতার ছোঁয়া জোরেসোরেই বলিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এ সময়গুলোতে। তথাপি এ ছবিটিতে তার সহজাত চিত্ররূপের পরিচয় আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

জয়নুলের ছবিতে রং-অথবা রং-হীনতা, খুব সহজেই তার বিষয় বস্তুকে তুলে ধরে। জয়নুল আঁকতেন বিষয়কে ভেবে ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় রং নির্ধারণ করত তার বিষয়। খুব-খুবই বলিষ্ঠ রেখায় তিনি কাজ করতে ভালবাসতেন, কারণ জীবনের শক্তিকে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন। সেখানে রং-হীনতা কোনো অন্তরায় নয়, বরং পরিপূরক"।

জয়নুল শিল্প সৃষ্টিতে একই সাথে প্রয়োগ করতেন কিউবিজম, রিয়েলিইজম, স্যুরিয়ালিইজম, ফবইজম, রোমান্টিসিজম, বা দাদা ইজম-এর অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রয়োগরীতিগুলোকে। একই ধারায় তাকে কখনো স্থায়ী রূপ দিতে দেখা যায়নি। তিনি বার বার ভেঙ্গেছেন আবার গড়েছেন আপন ভঙ্গিতে। এ জন্যই জয়নুলকে কখনো দেখা যায় সেজানের ভূমিকায় কখনো দেলাক্রেয়া বা পিকাসো পরক্ষণেই আমরা দেখি অবনীন্দ্র বা যামিনীরায়-এর ভূমিকায়। এভাবেই তিনি নিজেকে পরিবর্তন করেছেন প্রতিনিয়ত। বিশেষ করে ইউরোপ ভ্রমণের পরে 'ইম্প্রেশনইজম'-এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ওই রীতিতে পূর্ব বাংলার নারী সমাজের নানা মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কন করেন। আবার অন্য দিকে লোকশিল্পকলা বিশেষত বাংলার পুতুলের আকার-আকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওই রীতিতেও অনেক চিত্রাঙ্কন করেন। গ্রাফিকেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। এক কথায় বলা যায় জয়নুল আবেদিন ও তার শিল্পকর্ম ছিল অতি-উচ্চমানের যা শিল্পী ও সৃষ্টির পরিপূরক এবং অবিচ্ছেদ্য।

১৯৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এই কালজয়ী মহান শিল্পী। শৈশব থেকে শুরু করে ১৯৩৩-১৯৩৮-এ গবর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস" ক্যালকাটায়, প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত সৃষ্টি করে গিয়েছেন অসংখ্য চিত্রমালা। হাসপাতালে রোগ-শয্যায় থাকাকালীন জীবনের সর্বশেষ চিত্রকর্ম 'তরুণ-তরুণীর মুখ' আঁকেন কালো কালির তুলি-রেখায়। মাত্র ৬২ বছর বয়সে ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে এই মহান শিল্পী শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

# শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

এ কে এম মুজ্জাম্মিল হক

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী। তিনি এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ছিলেন। তিনি দেশের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চার পথিকৃৎ এবং আমাদের জাতিসত্ত্বাকে রং তুলির মাধ্যমে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। গ্রামীণ জীবনের প্রবহমান রীতি-নীতি, পালা-পার্বণ; গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের ছবি এঁকে লোকসমাজকে তুলে এনেছেন তাঁর চিত্রকর্মে। তিনি চিত্র এঁকেছেন বিচিত্র ফিগার ও রঙে। তাঁকে আমাদের শিল্প সংস্কৃতির শ্রমজীবী মানুষের বন্ধু, বাংলাদেশের কারুশিল্পের কর্ণধার বলা যায়। তিনি কেবল বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বে একটি পরিচিত নাম।

## জন্ম ও শৈশবকাল

জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম তমিজ উদ্দিন আহমেদ। মা জয়নাবুন নেছা খাতুন। তাঁর পূর্ব পুরুষদের আদিনিবাস ছিল পাবনায়। ১৯৬২ সালে ১২ বছর বয়সে তিনি ময়মনসিংহ শহরের আকুয়া মাদরাসা কোয়াটারের বাড়িতে চলে আসেন। ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকার সবুজ শ্যামলিমায় তিনি শৈশবকাল কাটান। এ জন্য জীবনের শুরুতেই নদী ও অবারিত প্রকৃতির পরশ পান। বাল্যকালে তিনি খুব লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। শৈশবে নদী, প্রকৃতি, নদীর ঘাটে কলসি কাঁখে গ্রাম্য বধূদের ঘাটে ওঠানামা, পাল তোলা নৌকা, মাঝি এসবই তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। তাই গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির তরুণ ছিলেন তিনি। প্রকৃতির অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হয়ে তিনি পথে, প্রান্তরে, আঁকা-বাঁকা নদীর ধারে ঘুড়ে বেড়াতেন। একসময়ে তিনি

এসব কিছু নিয়ে শিল্পী হৃদয়ের তাগিদ অনুভবের প্রেক্ষিতে বাল্যকাল থেকেই ছবি আঁকতে শুরু করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বাল্য ও কৈশোর ছিল প্রাণ চঞ্চল্যে পরিপূর্ণ।

স্মৃতি বিজড়িত নদী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমার শৈশব, আমার অতীত, আমার প্রিয় নদী, আমার প্রিয় মানুষগুলোর আমি কখনো ভুলতে পারি না'। অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন, 'এই নদী আমার মহান শিক্ষক; দুর্বার এক আকর্ষণে আমাকে টানে'।

"বাল্যকাল থেকে বিচিত্র প্রকৃতিই ছিল তাঁর প্রকৃত গুরু। এক কথায় প্রকৃতিই ছিল তাঁর জীবনরূপী পাঠশালার সত্যিকারের মাস্টার মশাই। আকাশ মেঘ বৃষ্টি, ফসলের মাঠ নদী খাল বিল পাখ-পাখালি বৃক্ষরাজি চাষি জেলে কামার কুমোর এরাই ছিল বালক জয়নুলের প্রকৃত শিক্ষক। তাই দেখা যেতো হাল্কা পাতলা একটি ছেলে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফসলের মাঠে, নদীর ধারে, ডোবার অস্বচ্ছ পানির কাছে, নদীর গভীরতা যেখানে সবচেয়ে বেশি, সেই বিশেষ স্থানের চিকচিকে কালো পানির দিকে চেয়ে চেয়ে, পাটগাছ থেকে পাট নিড়ানি দেখে, জেলের জাল ফেলা, তাঁতির তাঁত বোনা, কুমোরের মাটির হাঁড়ি তৈরি বা বেদেনির সাপের খেলা দেখে দেখে। অতি সাধারণ লোক ও অতি সুলভ বস্তুর সাথেও তিনি সর্বদা নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপনে সচেষ্ট হতেন। তার মা বলতেন টুনু সময় সুযোগ পেলেই গ্রামে চলে যেতো। চলে যেতো তার বোনের বাড়ি। সেখানে গ্রামের লোক বিশেষ করে গ্রামের টাইপ চরিত্রের লোকজন যেমন ভাঁড়, যাত্রার দলের লোক, ফকির দরবেশ, কিচ্ছা-কাহিনী জানা লোক, শিলুক বলা বুড়ো এবং এ জাতের অন্য লোকদের সাথে তিনি মিশতেন। তাদের সাথে বসে বসে নানা ধরনের গল্প শুনতেন। চাষি জেলে তাঁতি কামার কুমোর ও অন্যান্য গায়ে খাটা লোকের কাছে বসে শুনতেন ওদের কাহিনী, লক্ষ্য করতেন ওদের কাজের ধারা। যে বয়সে ছেলেমেয়েরা চপল চটুল মন নিয়ে দুরন্ত দুর্দম জীবনযাপন করে, জগৎ সংসারের অনেক কিছু থেকেই তাকে সম্পূর্ণ উদাসীন ও উদ্‌ভ্রান্ত, ঠিক এমনি একটা বয়সে জয়নুল প্রকৃতি ও গায়েখাটা মানুষের শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের সত্য ইতিহাস ও তার পর্যায়ক্রমিক যোগসূত্র গভীর মনোযোগের সাথে অনুসন্ধান করতেন।'[১]

'সেই সময়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেন প্রায়ই। ময়মনসিংহের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা নদী ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরে ঘুরে বেড়ানো ছিলো তাঁর ঝোঁক। একদিন হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন অনেক দূরে। দু'নয়ন ভরে বালক

জয়নুল দেখলেন গ্রাম-বাংলার অপরূপ রূপ, নতুন করে-সবুজ মাঠ, হলুদ ক্ষেত, দূরের ঘর-বাড়ি। সেই সাথে আরেকটি জিনিস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে-আন্দোলিত করে তাঁর মন-মানসকে, তা হচ্ছে নদীর দুই তীরবর্তী গ্রাম-বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা, নায়ের মাঝি আর তার গান, মাঠের কৃষক আর তার কঠোর শ্রমের শরীর, জেলে, তাঁতি, কামার-কুমোর, জীর্ণ-শীর্ণ গাঁয়ের বধূ। রোদেপোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা সেই সব মানুষ তাঁর মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। তাঁর মনে জেগে ওঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন-নানা জিজ্ঞাসা : তাঁর সেই অবুঝ কচি মনে চিন্তা দোলা দেয়, তিনি রীতিমতো নেশায় পড়ে যান।'[২]

জয়নুলের প্রেরণার উৎস ও শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে 'জয়নুলের জলরঙ' শীর্ষক গ্রন্থে জনাব মতলুব আলী লিখেছেন, 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের চিত্রাঙ্কনের তথা শিল্প-চর্চার আগ্রহের উৎস সন্ধানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দু'টি দিক খুব স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। প্রধানত খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় গ্রাম বাংলার মানুষ ও বাংলাদেশের প্রকৃতির প্রতি। আমাদের এই চির-সবুজ বন-বনানী-দিগন্ত ঘেরা প্রকৃতি, পরিবেশ তথা বিচিত্র বর্ণিল ঋতু আবর্তিত নিসর্গ-দৃশ্য আর নদী ও নীলাকাশ পরিবেষ্টিত চিরন্তন দৃশ্যাবলি জয়নুল আবেদিনের অনুপ্রেরণার প্রাথমিক উৎস। দ্বিতীয়ত আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত লোক-সাংস্কৃতিক সমাজ-পরিবেশ। সর্বত্র তাঁর চারপাশে জয়নুল এমন বাস্তব অবস্থা ও আনুকূল্যই পেয়েছিলেন যা একজন সৃজনশীল প্রতিভাধারী ব্যক্তির শিল্পী-ব্যক্তিত্ব হিসেবে বেড়ে ওঠার অনুকূলে স্বাভাবিক ক্ষেত্র তৈরি করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।'

## শিক্ষা জীবন

এই প্রথিতযশা শিল্পী প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন নিজ শহরের পণ্ডিতপাড়া পাঠশালায়। এরপর ময়মনসিংহ জেলা স্কুল এবং মৃত্যুঞ্জয় ইংলিশ হাইস্কুলে। এসএসসি পরীক্ষার পূর্বেই বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে তিনি কোলকাতা চলে যান এবং ১৯৩৩ সালে কোলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে ৫ বছর সেখানে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে জয়নুল আবেদিনের উপর তার মাতার প্রভাবই বেশি ছিল। তিনি তার সোনার হার বিক্রি করে জয়নুলের কোলকাতা সরকারি আর্ট কলেজে লেখাপড়ার আয়োজন করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি 'ড্রইং এ্যাণ্ড পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট' থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার জন্য দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়নকালে একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি শৈশবের অনুপ্রেরণায় শান্ত-স্নিগ্ধ জীবন ও

প্রকৃতিতে আলোড়িত হয়ে রোমান্টিক ধারার চিত্রাঙ্কন করতে থাকেন। এজন্য তাঁর চিত্রাঙ্কনের একটা বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ। তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সংমিশ্রনে নিজস্ব একটি ধারা সৃষ্টির প্রয়াস চালান।

**কর্মজীবন**

১৯৪৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার বিভাগের প্রধান নকশাবিদ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ঢাকায় ফিরে এসে ১লা মার্চ তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে কাজে যোগদান করেন। তিনি দেশে একাধিক একক প্রদর্শনী করেন। তাঁর সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের উপর এক ডজনের বেশি ছবি আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী থেকে দেশের জন্য সাফল্য ব্যায় আনে।

১৯৩৮ সালে ভারতের ফাইন আর্টস একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত সর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে তাঁর অংকিত জলরঙ ছবির জন্য তিনি গভর্নরস্ 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন। এই স্বীকৃতিই জয়নুলকে প্রথমবারের মতো আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে আসে।

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে এদেশের হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। তখনকার এই দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুরতা, নৈতিক বিপর্যয় এবং নির্যাচিত মানুষের অমানবিক দুর্দশা তাঁকে আলোড়িত করে, যার ফলে এই দুর্ভিক্ষের উপর ছবি একে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও গতিময়তা অবলোকন করা যায়। এই অভাবনীয় শক্তিই তাঁর চিত্রকলাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক মহিমায় উজ্জ্বল করে রেখেছে, যা পৃথিবীর আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কারণেই তিনি অকল্পনীয় সৌভাগ্যের অধিকারী হন। শিল্পাচার্যের শিল্পকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য রেখার প্রাধান্য এবং প্রয়োজন মাফিক স্বল্পতম ব্যবহার। যে কারণে তাঁর প্রায় সব ছবিই প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত দ্বিমাত্রিক অবয়বে উপস্থিত।

১৯৫১ এবং ১৯৭১ সালেও তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করেছেন। ১৯৪৭ সালে পর জয়নুল আবেদিন ঢাকায় বসবাস শুরু করেন।

১৯৫৪ সালে আমেরিকার রকি ফেলার ফাউন্ডেশন তাঁকে ট্রাভেলিং ফেলোশীপের অধীনে বিশ্বের সমস্ত জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য ফেলোশীপ প্রদান করেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে সম্মানিত 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' শীর্ষক সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাবে ভূষিত করেন।

১৯৫৯ সালে তাঁকে সংস্কৃতিকর্মীদের সর্বোচ্চ সরকারি খেতাব 'হিলাল-ই-ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। কিন্তু তিনি তা বর্জন করেন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের বিজয়কে ভিত্তি করে আঁকা ৬৫ ফুট দীর্ঘ পট চিত্র 'নবান্ন' পেইন্টিং এর মাঝে তাঁর চিত্রকর্মের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

১৯৬১ সালে ইউএসএসআর সরকার দেশের ফাইন আর্টস এর চর্চায় অভাবনীয় উন্নতি সাধনের প্রেক্ষিতে 'গোল্ড মেডেল' প্রদান করেন।

দীর্ঘ ১৮ বছর পার ১৯৬৬ সালের ৪ জুলাই চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ থেকে তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর শিল্পভুবন বৈচিত্র্যময় সৃজন সম্ভারে পরিপূর্ণ। দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষ ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলী তার চিত্রপটে স্থান পায়।

এছাড়া ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারানো দেশের হাজার মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অংকিত ৩০ ফুট দীর্ঘ 'মনপুরা' চিত্রকর্ম অংকনের মধ্যেও তার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য অবলোকন করা যায়।

১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বাংলা একাডেমীর সভাপতি এবং জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

১৯৭৪ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রী প্রদান করেন।

### তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু শিল্পকর্ম

'কলসি কাঁখে রমণী', 'মা ও শিশু', 'আলিঙ্গন', 'গুণ টানা', 'কেশ বিন্যাস', 'কাক', 'গেরিলা', 'দূর্ভিক্ষ' 'রেখাংকন', 'ম্যাডোনা', বাথিং ওম্যান', 'নবান্ন', 'দুটি মুখ', 'মই দেয়া', 'সংগ্রাম', 'বিদ্রোহী', 'সাঁওতাল দম্পতি', 'রমণী ও কলস', 'স্নান শেষে', 'মাছ ধরার পর', 'খেয়াঘাটে অপেক্ষা', 'পল্লী এলাকার দৃশ্য', 'রমণী', 'সাপুড়ের মেয়ে', 'চিন্তা', 'দুই মহিলা', 'দুটি গরু', 'বুড়িগঙ্গা' 'জলরঙ-স্কেচ', 'একটি জলরঙ', 'কৃষক', 'বৃক্ষরাজি', 'তেতাল্লিশের স্কেচ-মালার চিত্র' 'পাইন্যায় মা' 'একজন প্যালেস্টাইন', 'জর্ডান ও কায়রো', ক্রুদ্ধ ষাড়', 'ঝড়ের মধ্যে গরু', ইত্যাদি।

## তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট। তিনি ময়মনসিংহ আর্ট গ্যালারিরও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত গ্যালারির নাম করণ করা হয় জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা। বর্তমানে এ সংগ্রহশালাটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

পঞ্চাশ এবং ষাট দশক ধরে তাঁর চিত্রকর্মে নান্দনিকতা ও গ্রাম বাংলার পল্লীর বিষয়বস্তু লক্ষ্য করার মত। তাঁর কর্মপরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি লোকশিল্পকলার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেন। ফলে তিনি ফিরে আসেন গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতির কাছে। তাই প্রবহমান জীবনের দৈনন্দিন সংগ্রামের মাঝে রীতি ও বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে বাস্তবতার নিরিখে দেশের নিজস্ব মননের প্রতীক হিসেবে লোককারুশিল্পের নিদর্শনসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য বাংলার প্রাচীন রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁকে বেছে নেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ সরকার ১৯৭৫ সালের এক প্রজ্ঞাপনবলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নামে এখানে একটি জাদুঘর আছে।

এ জাদুঘরে গ্যালারি সংখ্যা দুটি-

১. দারুশিল্প গ্যালারি;

২. নকশি কাঁথা ও জামদানি গ্যালারি।

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের দারুশিল্প গ্যালারিতে কাঠের তৈরি প্রাচীন ও আধুনিক কালের নিপুণ কাঠখোদাই নিদর্শন দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কাঠ থেকে বিভিন্ন কারুপণ্য তৈরি ও বিক্রয়ের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে ডিওরামা মডেলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পরিবেশে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে লোকালয়ে আনা, কর্মরত কারুশিল্পী কর্তৃক কাঠের কারুশিল্প তৈরি এবং তৈরি কারুশিল্প হাট-বাজারে, মেলায় বিক্রির ব্যবস্থা ডিওরামার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে কাঠের কারুশিল্প তৈরিতে গ্রামীণ লোকজীবন কিভাবে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রামীণ লোক জীবনধারায় যেসব কাঠের ব্যবহার আবহমান কাল থেকে হয়ে আসছে তার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এতে আমাদের প্রবহমান জীবনাচরণের কাঠের কারুশিল্পের বর্তমান ও পুরোনো ঐতিহ্যের ধারাকে পাশাপাশি প্রদর্শন করা হয়েছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় প্রথম তলার ন্যায় স্থির ডিওরামায় উপস্থাপিত পরিবেশে বস্ত্রজাত কারুশিল্পের প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ পরিবেশ তুলে ধরা হয়েছে। বস্ত্র জাত কারুশিল্পের মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান তুলা। বাংলায় প্রাচীনকালে উৎকৃষ্ট মানের কার্পাস তুলা উৎপন্ন হতো। সেই তুলা দিয়েই বস্ত্র তৈরি করত তাঁতিরা, মেয়েরা পুরোনো কাপড় দিয়ে নকশিকাঁথা তৈরি করতো। এই ডিওরামায় কার্পাস তুলার ক্ষেত থেকে তুলা সংগ্রহ, তুলা থেকে বীজ ছাড়ানো, চড়কায় সূতা কাটা, সূতায় তানা বানানো, তাঁতে জামদানি শাড়ি তৈরি ও গ্রামের হাট-বাজারে শাড়ি বিক্রির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এছাড়া ঘরের উঠানে বাচ্চাকে পাশে রেখে পুরোনো শাড়ি কাপড় দিয়ে মা নকশিকাঁথা সেলাই করছে। স্থির ডিওরামার মাধ্যমে পরিবেশের প্রয়োজনীয় ভাস্কর্য সৃষ্টি করে গ্রামীণ পরিবেশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত পরিবেশে জাদুঘর পরিদর্শনে আগত দর্শক-পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও গ্রামীণ পরিবেশের চিত্র তৈরিতে বস্ত্রজাত কারুশিল্প জামদানি শাড়ি ও নকশিকাঁথা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই গ্যালারিতে বস্ত্রজাত কারুশিল্পের প্রদর্শনীর মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক সোনাগাঁয়ের তৈরি বাহারি জামদানি শাড়ি; নকশি কাঁথায় বাংলাদেশের মানচিত্রসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নকশি কাঁথা; তামা-কাসা পিতলের নিদর্শন এবং রূপার তৈরি লোকজ অলংকার। শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর জাতিতত্ত্ব গবেষণার পদ্ধতিকে ধারণ করছে। এই জাদুঘর দেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রযত্ন পরিষদের প্রথম সম্মানিত সভাপতি ছিলেন। সভাপতি হিসাবে এখানে তার তাঁর দায়িত্বকাল ০১-০৬-১৯৭৫ থেকে ১২-০৫-১৯৭৬ পর্যন্ত।

এই স্বনামধন্য শিল্পীর অসাধারণ শিল্প মানসিকতা ও কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হোন। শিল্পাচার্য অর্থাৎ শিল্পের আচার্য। আচার্য শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শিক্ষক, পরিচালক ইত্যাদি। অর্থাৎ শিল্পকলা বিষয়ে যিনি একজন নিবেদিত প্রাণ, যাঁর সাহচর্যে সমস্ত জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা পরিণতি লাভ করে। তিনি এদেশের মানুষের হৃদয় জুড়ে শিল্পাচার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তাই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নাম বাংলাদেশের মানুষের কাছে অতি পরিচিতি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম এদেশের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে চিরদিন অনুস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই মহান শিল্পী ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে ৬২ বছর বয়সে ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শাহবাগের পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে চারুকলা ইনস্টিটিউট সংলগ্ন চত্বরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলা চর্চার পথিকৃৎ ছিলেন। কর্মগুণে খ্যাতির শিখরে ওঠা মহান এই শিল্পী দেশের চিত্রকলার ইতিহাসে অনন্য স্থান জুড়ে রয়েছেন।

**তথ্যসূত্র**


১। আব্দুল মতিন, জয়নুল আবেদিন, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৮।

২। জয়নুলকথা, মানব প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৭।

৩। মতলুব আলী, জয়নুলের জলরঙ, বাংলা একাডেমী, আগস্ট ১৯৬৬ ঢাকা।

৪। Bangladesh Quarterly, September-1991.

৫। এ, সাত্তার, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, ইনিস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢা: বি: ১৯৮৮, ঢাকা।

# প্লেট

আলোকচিত্র সংগ্রহ

এ. কে. এম আজাদ সরকার
ডিসপ্লে অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-৭৬)

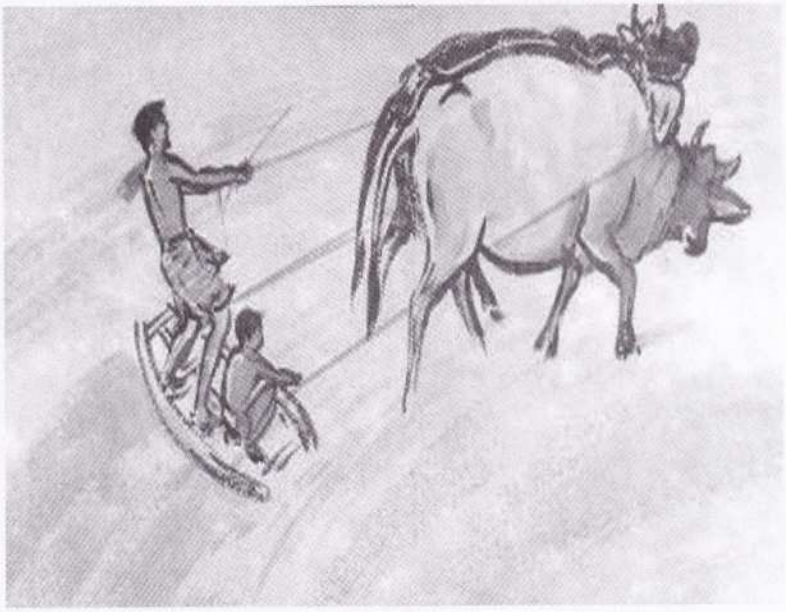

'মই দেয়া'-১৯৫৯

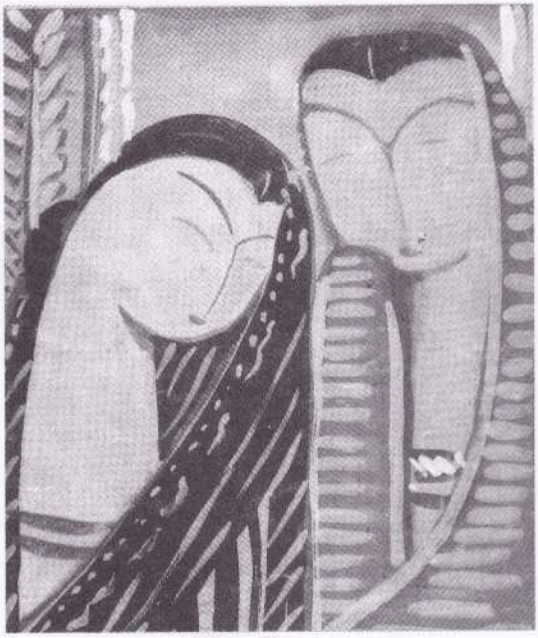

'দুই রমণী'-১৯৫১

'বৃদ্ধ'-১৯৪৩

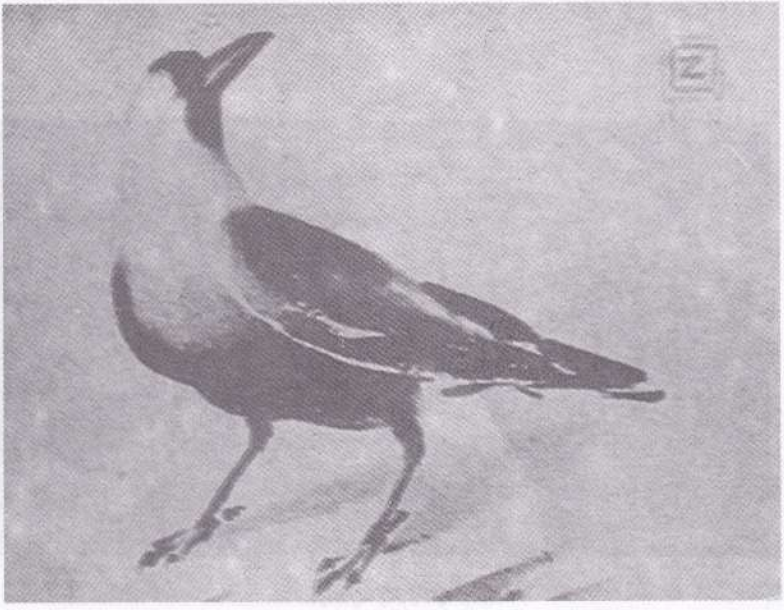

'কাক'

'তেতাল্লিশের স্কেচ-মালা'

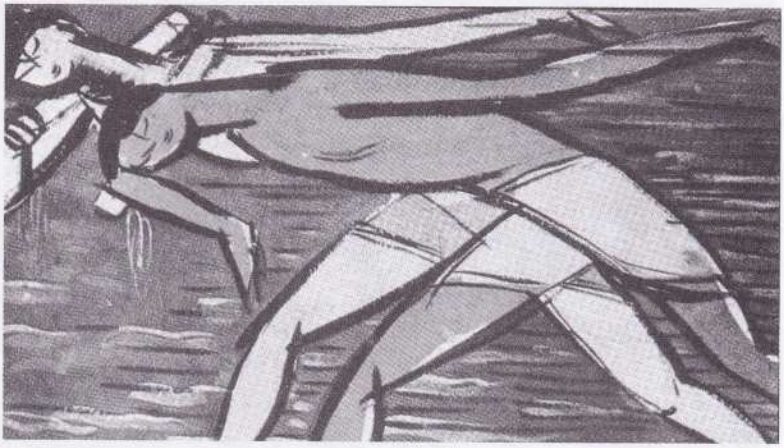

'গুণটানা'-১৯৬৪

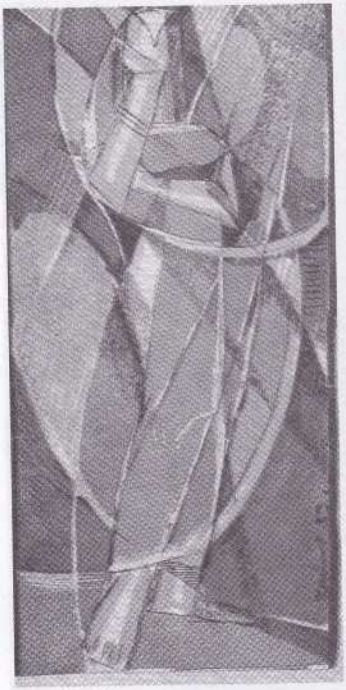

'স্টাডি ফর ওমেন'

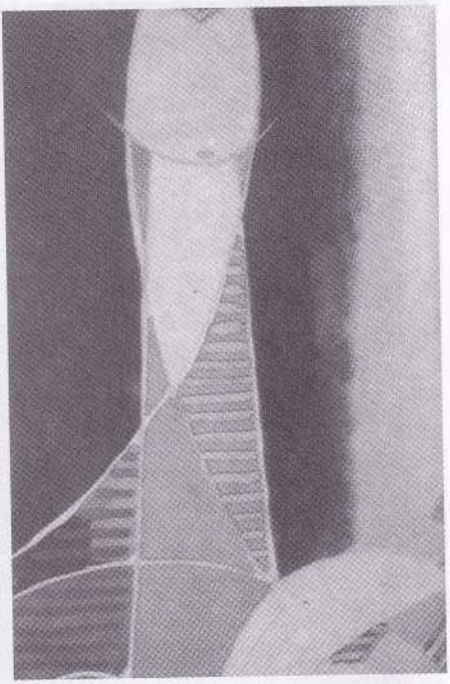

'কলসি কাঁখে'-১৯৫১

'নিসর্গ' (অনুশিলন)

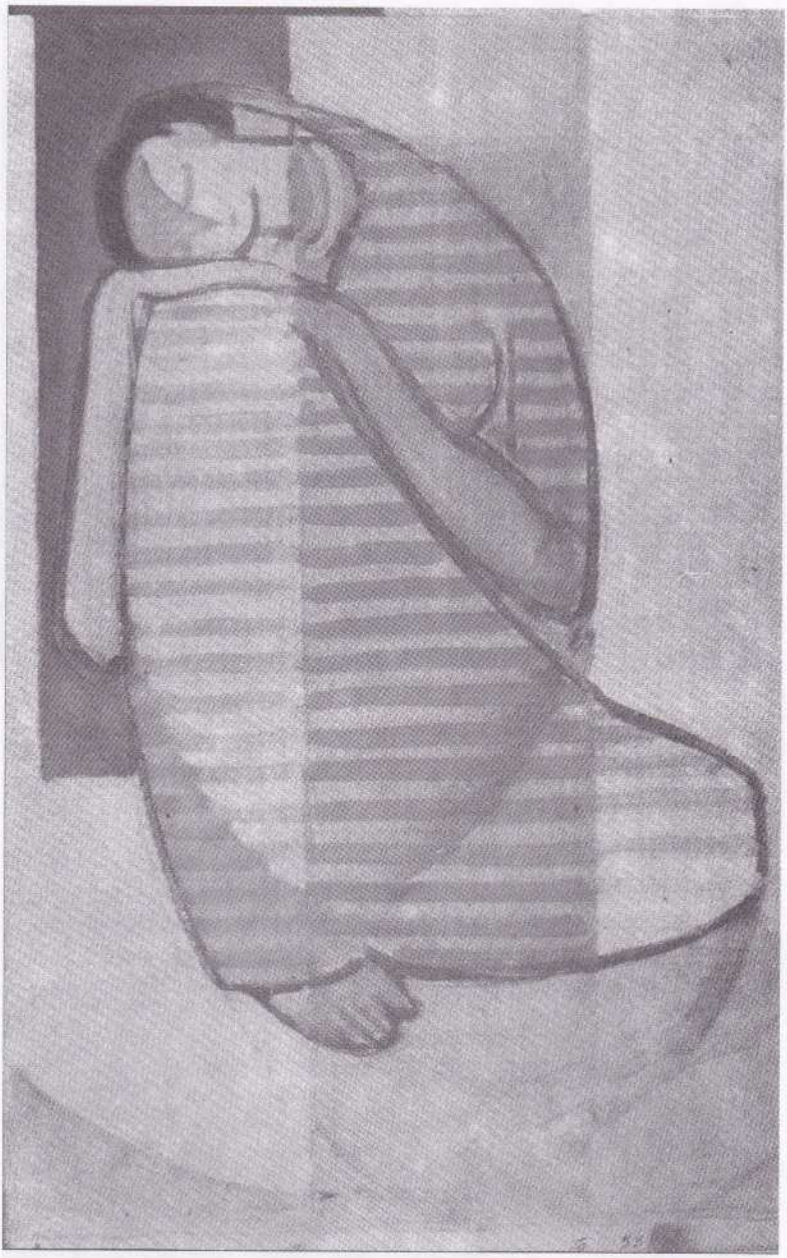

'চিন্তা'-১৯৫৩

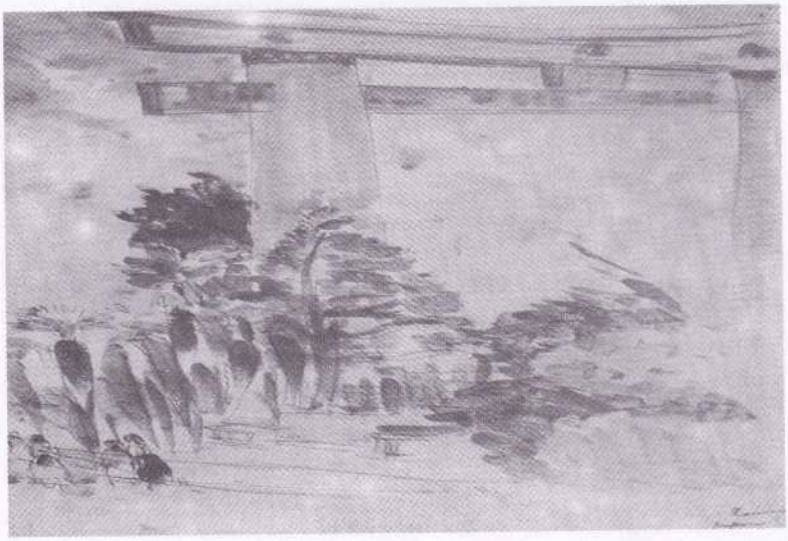

'তরুণ (জাপান)'-১৯৫৬

'স্টাডি ফর পেইন্টিং (গুণটানা)'

'বিদ্রোহী'-১৯৫১

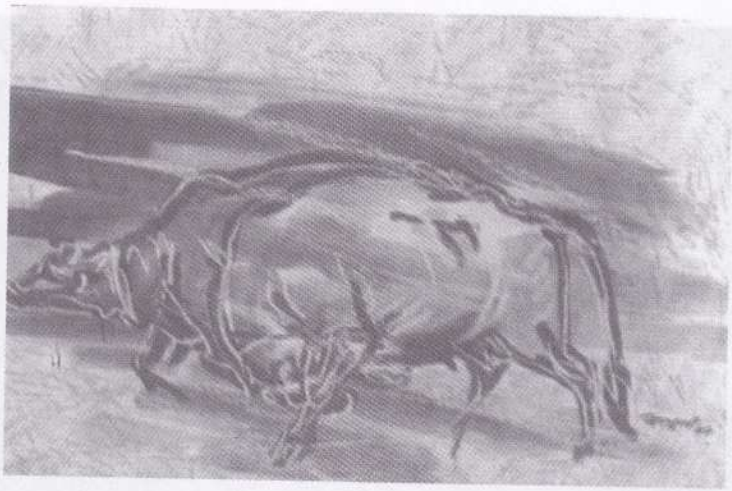

'দুটি গরু'-১৯৭৫

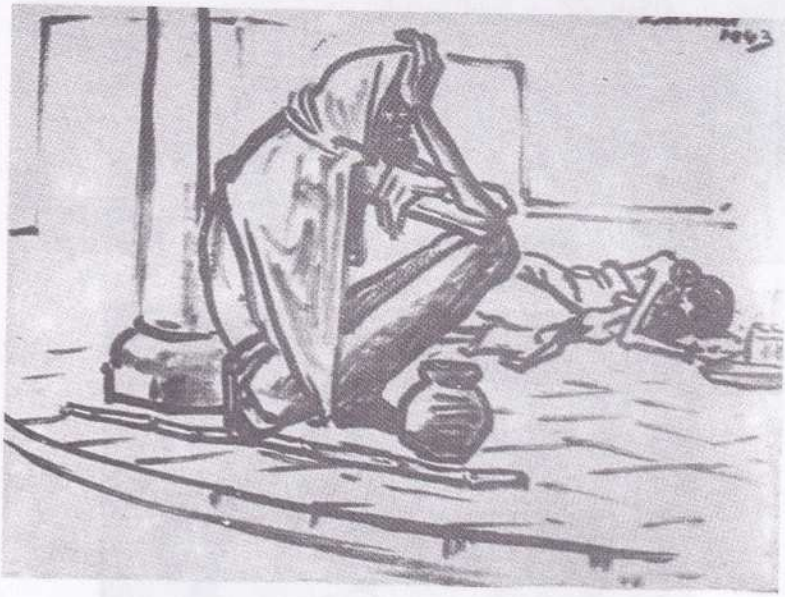

'তেতাল্লিশের স্কেচ-মালা'

'রমণী ও কলস'-(ষাটের দশকে)

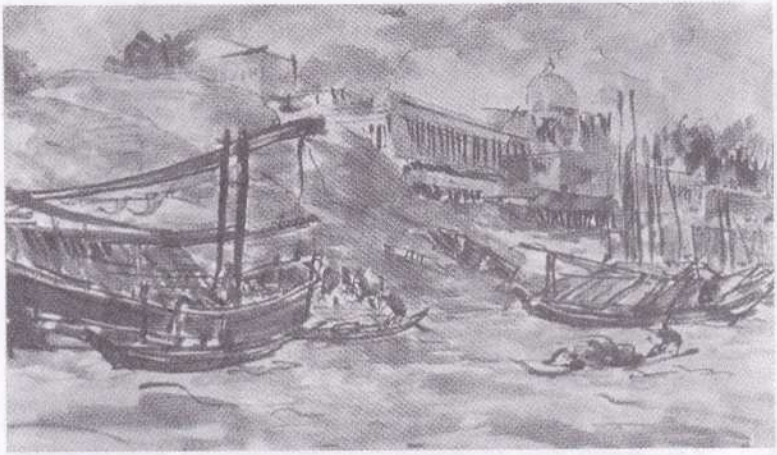

'বুড়িগঙ্গা'-১৯৬২

'গুণটানা-২'-১৯৬৪

'খেয়াঘাটে অপেক্ষা'-১৯৫১

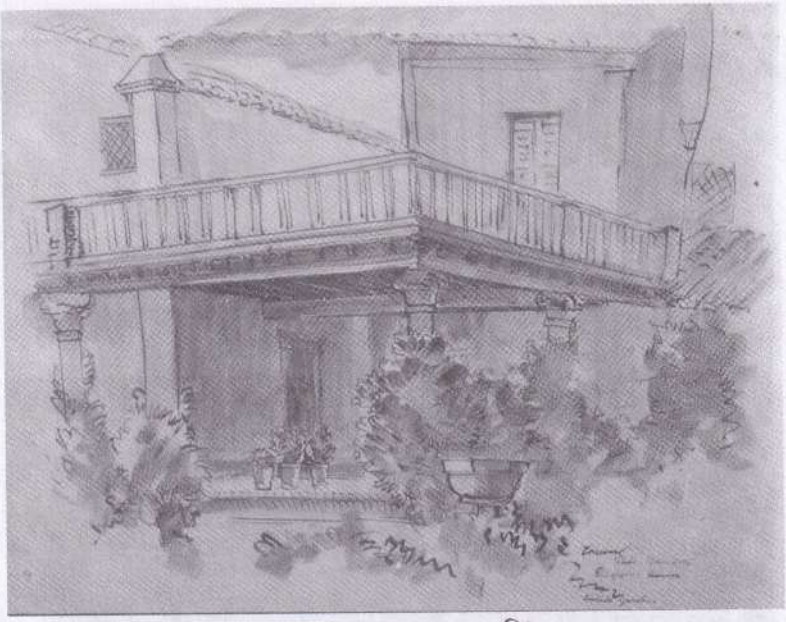

'বারান্দা' (এল্ গ্রেকোর বাড়ি)

'কৃষক'-১৯৫৩

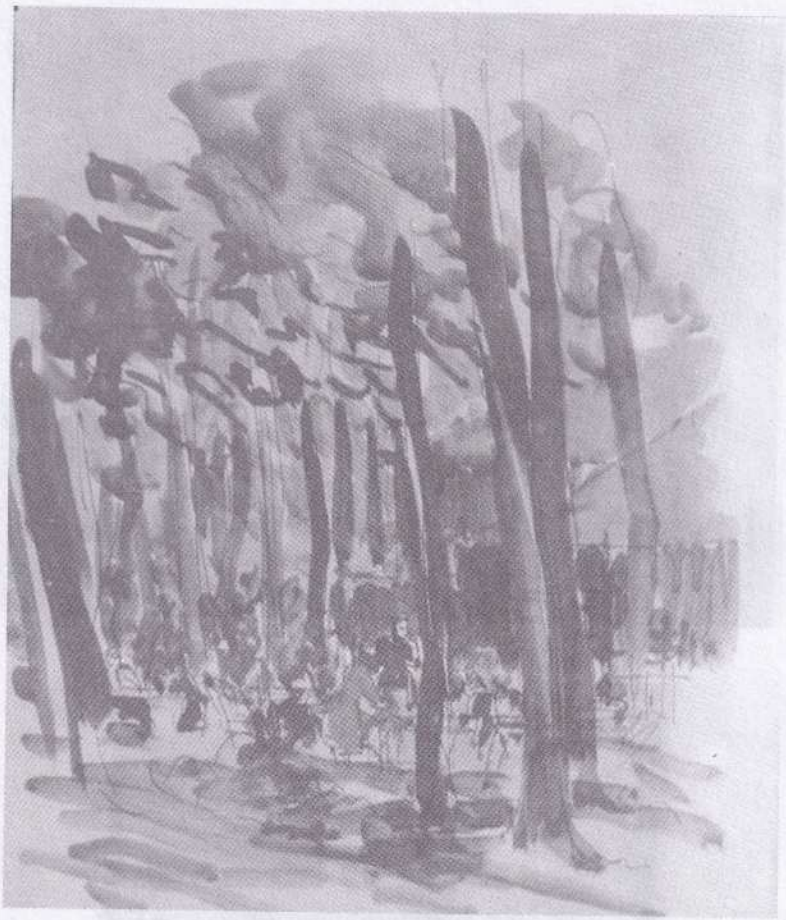

'স্কেচ'-১৯৫৬

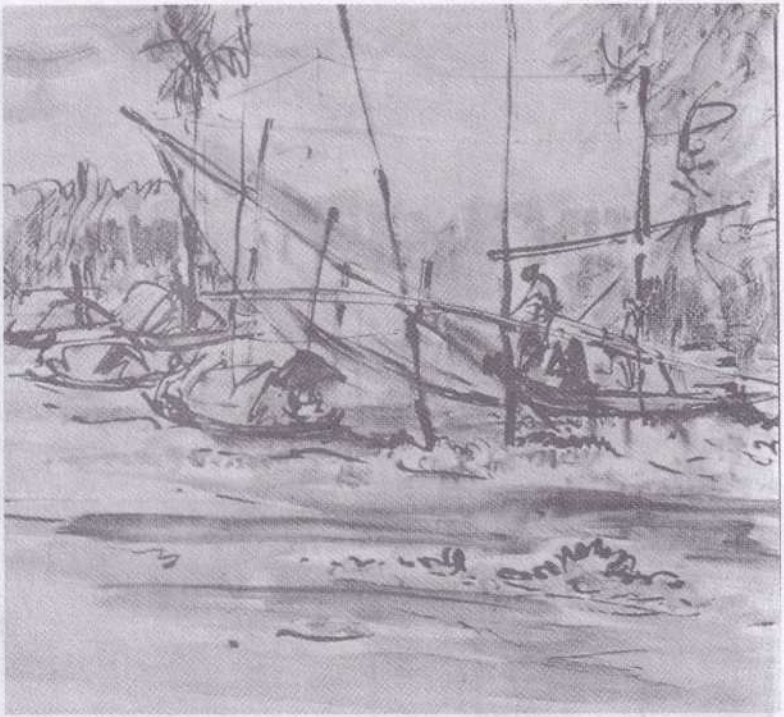

'মাছ ধরা'-১৯৫০

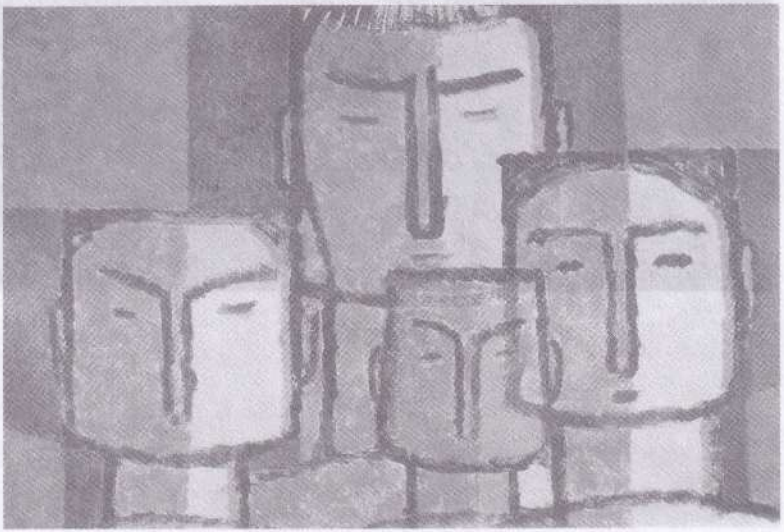

'চার মুখ'-১৯৬৬

'সাঁওতাল দম্পত্তি'-১৯৫১

'দুজন সাঁওতাল রমণী'-১৯৫১

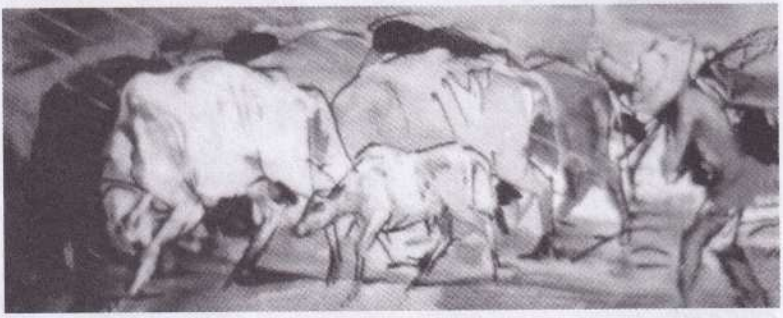

'অনুশীলন স্কেচ'

'মা ও ছেলে'-১৯৬১

'নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে'-১৯৫৭

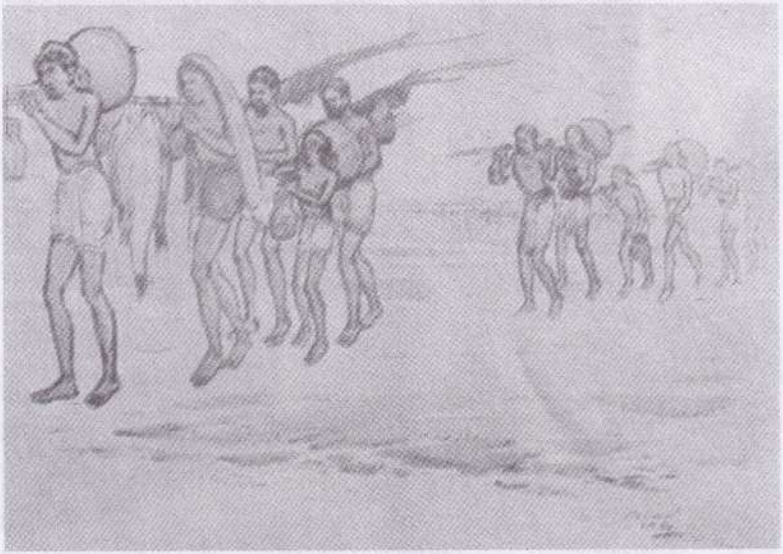

'মাছ ধরার পর'-১৯৫০

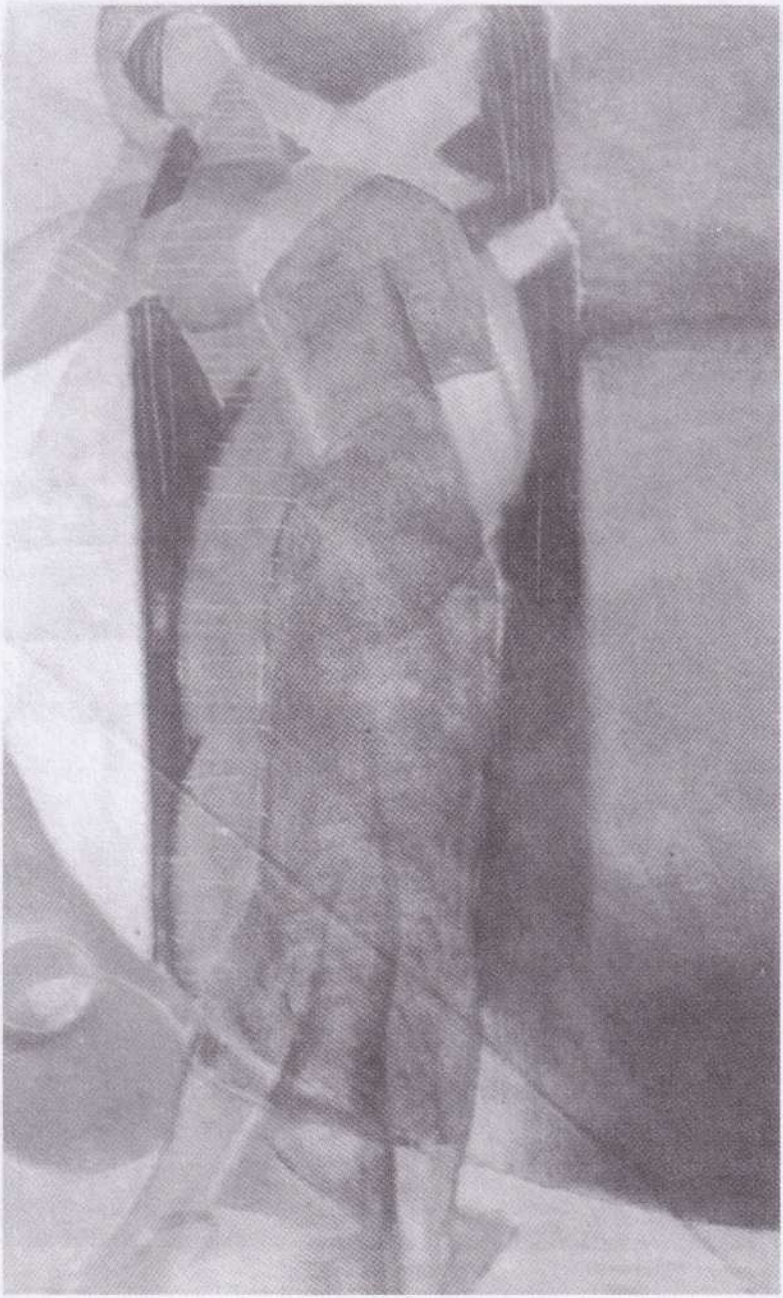

'স্নান শেষে'-১৯৫১

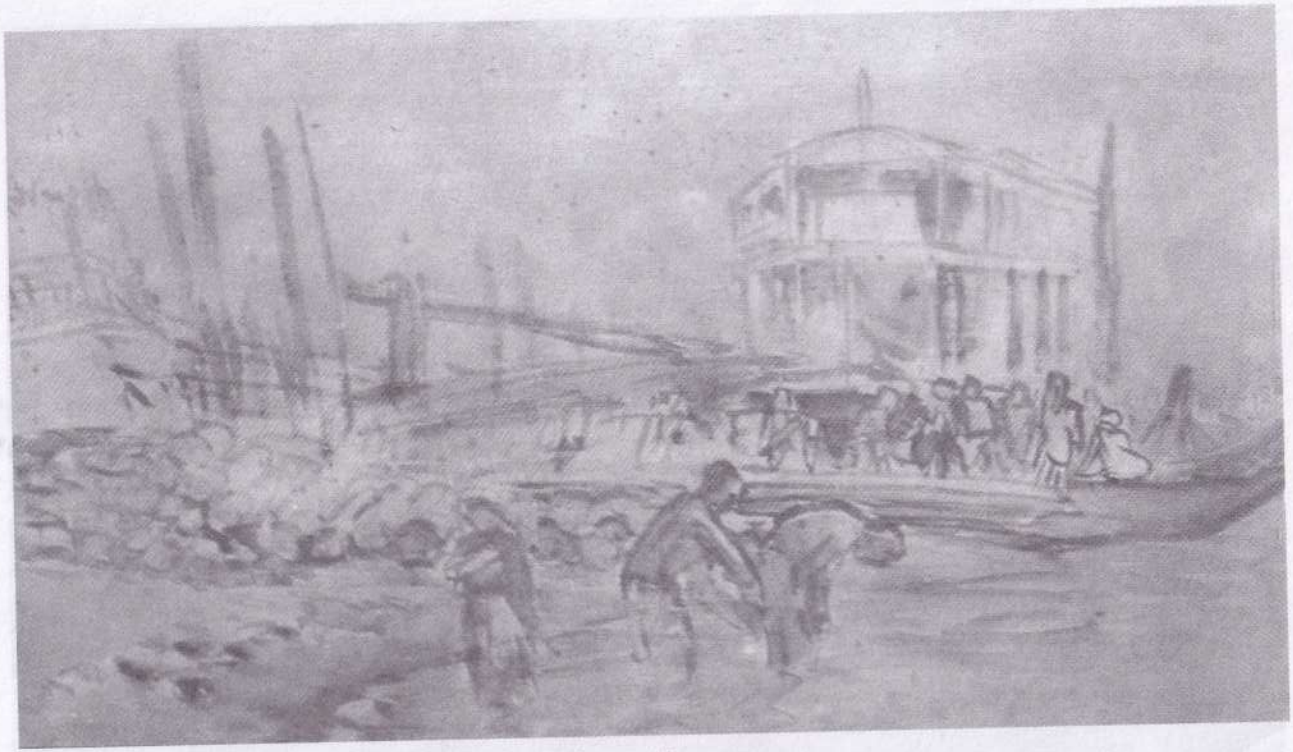

'স্টিমার ঘাট'-১৯৫৬

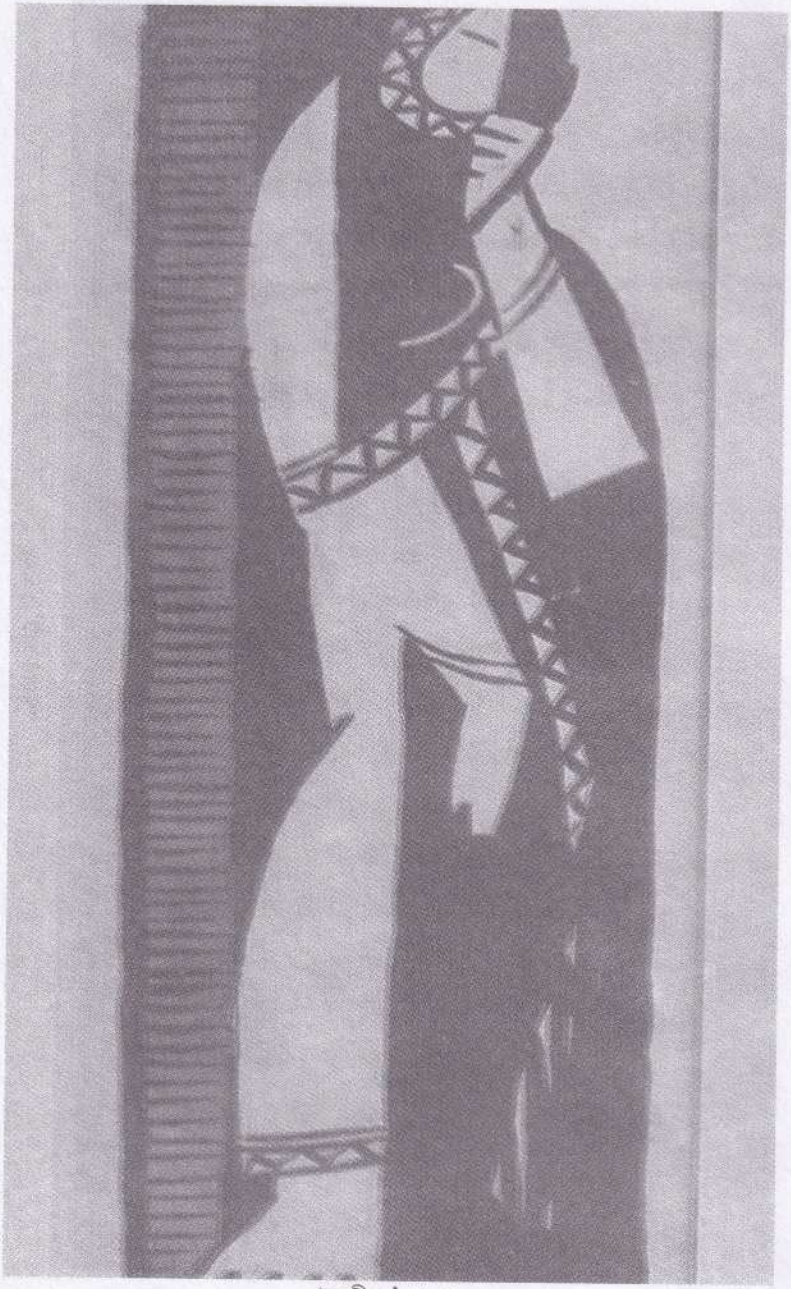

'রমণী-১'-১৯৫১

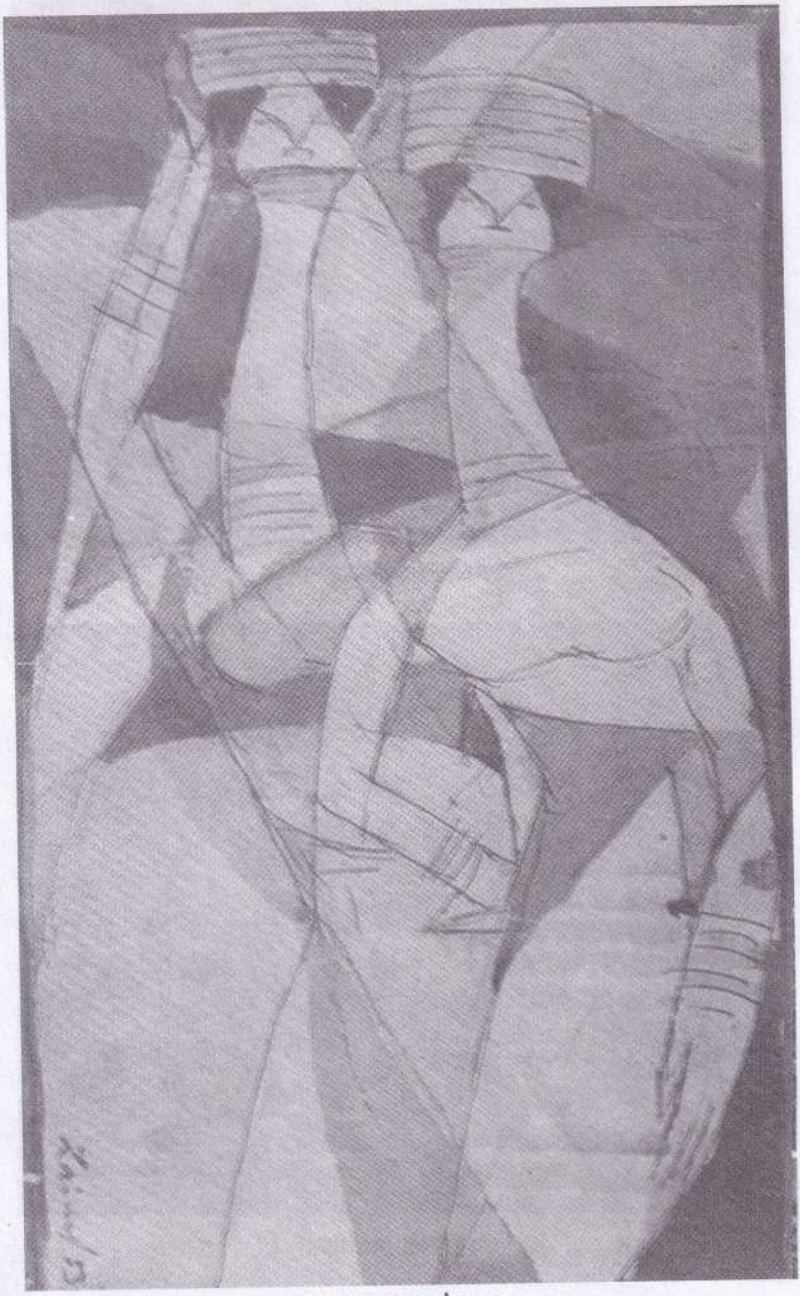

'সাপুড়ের মেয়ে'-১৯৫৩

'তেতাল্লিশের স্কেচ-মালা'

'তেতাল্লিশের স্কেচ-মালা'

'টয়লেট'-১৯৬৬

'দুই সাপুড়ে'-১৯৭২

'তেতাল্লিশের স্কেচ-মালা'

'মুক্তিযুদ্ধ'-১৯৭১

'বিরঙ্গনা'-১৯৭১